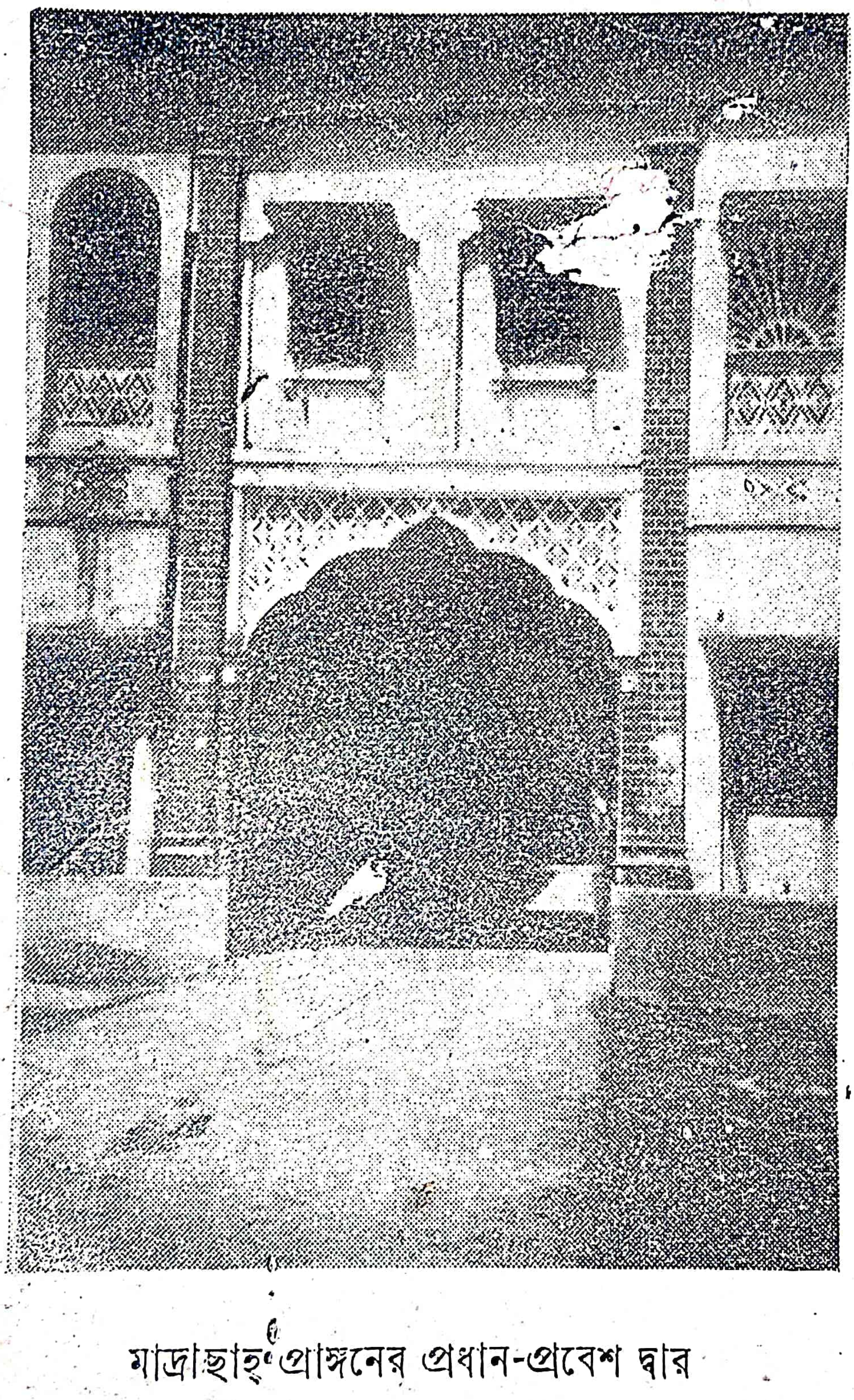
মরহুম পীর ও আল্লামা হজরত মাওলানা শাহ ছুফী আলহাজ্জ
নেছারুদ্দীন আহমদ রহ.মতুল্লাহ আলাইহের জীবনী

ছীরতে নেছারিয়া

প্রথম ভাগ

নূরুদ্দীন আহ্‌মদ



মাদ্রাছাহ্‌ প্রাঙ্গনের প্রধান-প্রবেশ দ্বার

লেখা ও প্রকাশ ঃ
শর্ষিণা দরবার শরীফের পক্ষে
নূরুদ্দীন আহ্‌মদ

প্রথম ছাপা ঃ
২০০০ হাজার

মুদ্রণ কাল ঃ
১৯৫২—ডিসেম্বর

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শর্ষিণা মাদ্রাছাহ্‌ লাইব্রেরী
পোঃ দারুছ্‌ছুন্নৎ, বাকেরগঞ্জ

দাম ঃ
মলাট ২৲ টাকা
বাঁধাই ২॥০ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
মোঃ মোতাহার হুসেন
দি সিটি প্রেস
১৬/৩ কোর্ট হাউস্‌ ষ্ট্রীট্‌, ঢাকা
(পাকিস্তান)

শর্ষিনার ছাজ্জাদা-নশীন পীর ছাহেবের অভিমত

"মরহুম পীর ও ওয়ালেদ ছাহেব কেবলার এন্তেকালের পর তাঁহার ছাওয়ানেহ্‌ ওম্‌রী প্রকাশ করার জন্য আমাদের বহু ভাই আমাদের নিকট অনুরোধ জানান। ইহাতে আমরা এ বিষয় পরামর্শের জন্য একটি বৈঠক আহ্বান করি। এই বৈঠকে পীর ছাহেব মরহুমের দরবারের লেখক ও বহুদিনের সংশ্লিষ্ট মওলবী নূরুদ্দীন আহমদ ছাহেবের উপর এই মহান কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অতঃপর মওলবী ছাহেব বহু পরিশ্রম করিয়া হুজুরের জীবনীর ১ম খণ্ড লিখা সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা এই বইখানার আদ্যোপান্ত পাঠ করাইয়া শুনিয়াছি। আমরা এ বিষয় আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোক্‌রিয়া আদায় করিতেছি এবং তাঁহার দরবারে আরজ করিতেছি—তিনি আমাদিগকে ও অন্যান্য মুছলমানগণকে হুজুর মরহুমের ছাওয়ানেহ্‌ ওম্‌রী অনুযায়ী আমল করিবার তওফিক এনায়েত করেন।"

আমীন !

شاہ محمد صدیق
(মধ্যম পীরজাদা ছাহেব)

شاہ ابو جعفر محمد صالح
(পীর ছাহেব শর্ষিণা)

ডাঃ মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট ছাহেবের অভিমত

"হয়রত মাওলানা শাহ্ ছুফী আল্‌হাজ্জ নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ্‌মতুল্লাহ্ আলাইহে) সুবিখ্যাত মুজাদ্দিদে যমান হযরত শাহ ছুফী আল্‌হাজ্জ মুহম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী (রহ্‌মতুল্লাহে আলাইহে) সাহেবের একজন প্রধান খলীফা ছিলেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর। তাঁহার নিজের ত্যাগ স্বীকারে এবং চেষ্টায় শর্ষিণার দারুছ্ ছুন্নৎ আলিয়া মাদ্রাছাহ্ এবং তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলি প্রতিষ্ঠিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। বাংলা দেশে তাঁহার অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত বিদ্যমান আছে। এরূপ ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরের একখানি জীবনী যে অত্যন্ত বাঞ্ছিত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মওলবী নূরুদ্দীন আহমদ সাহেব শর্ষিণার পীর সাহেব মরহুমের একজন মুরীদ ও খলীফা এবং সহকর্ম্মী। সুতরাং তিনি যে তাঁহার জীবনী লিখিবার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি, এ কথা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় তিনি এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমি রহ্‌মানুর রহীমের দরগায় দো'আ করি যেন তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয়। আমীন! ইতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
(খাদেমুল উলামা ও ফুকারা)

লেখকের আরজী

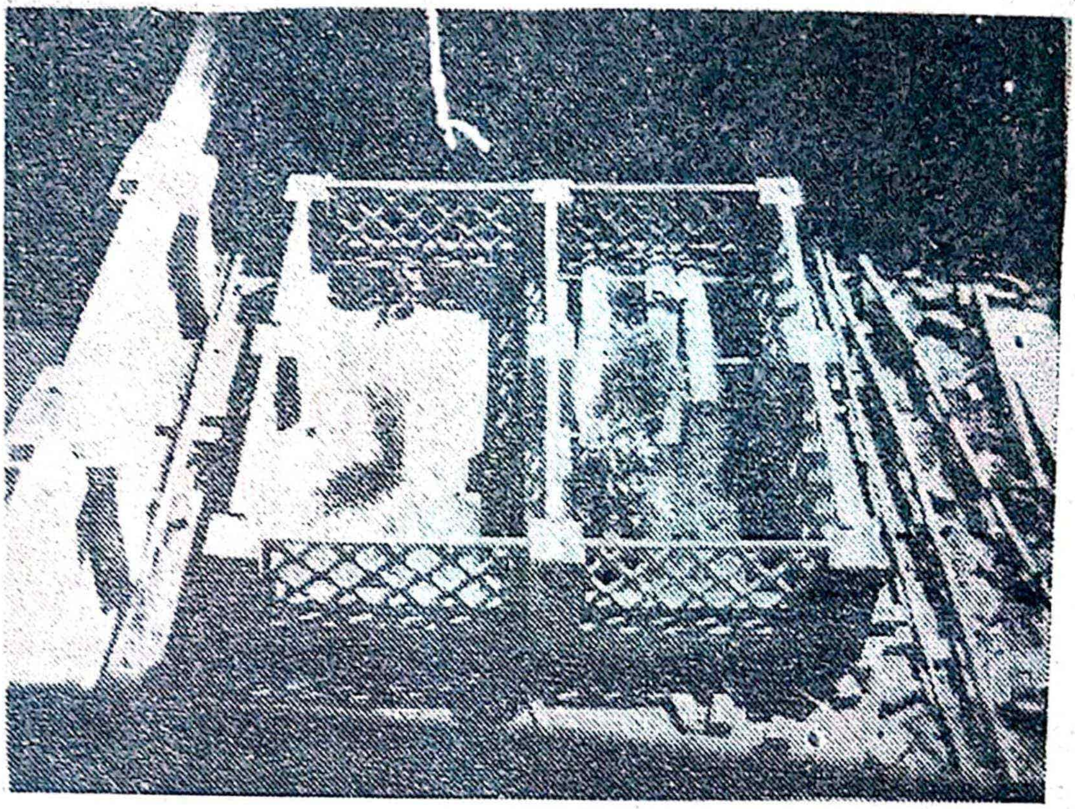
মরহুম পীর ও আল্লামা হজরত মাওলানা শাহ্ ছুফী আল্‌হাজ্জ্ নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব কেবলার বিরাট কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ইছলামের খেদমতেই নিয়োজিত ছিল। তাঁহার অপরিমাণ খেদমত ও আত্ম-ত্যাগ পাক-ভারত অতিক্রম করিয়া দুনিয়ার দিকে দিকে সাড়া জাগাইয়াছে। সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবন ছিল ইছলামী আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। তাঁহার সংসর্গের স্পর্শ ছিল পরশ-মণি তুল্য। তিনি সংগ্রাম করিতেন বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে—সংগ্রাম করিতেন ভিতরে—কঠোর সংগ্রাম। তিনি একাধারে যেমন গঠন করিতেন মানুষ, দেশ ও জাতি, তেমনই গঠন করিতেন নিজেকে।

বহু দেশসেবক দেখা যায়, বাহিরে তাঁর বিপুল কর্মের জয়-ঢাক, কিন্তু ভিতরে নিজের বেলায় তাঁর কোনও সংগ্রাম নাই; তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কোনও স্পর্শ নাই—দান নাই।

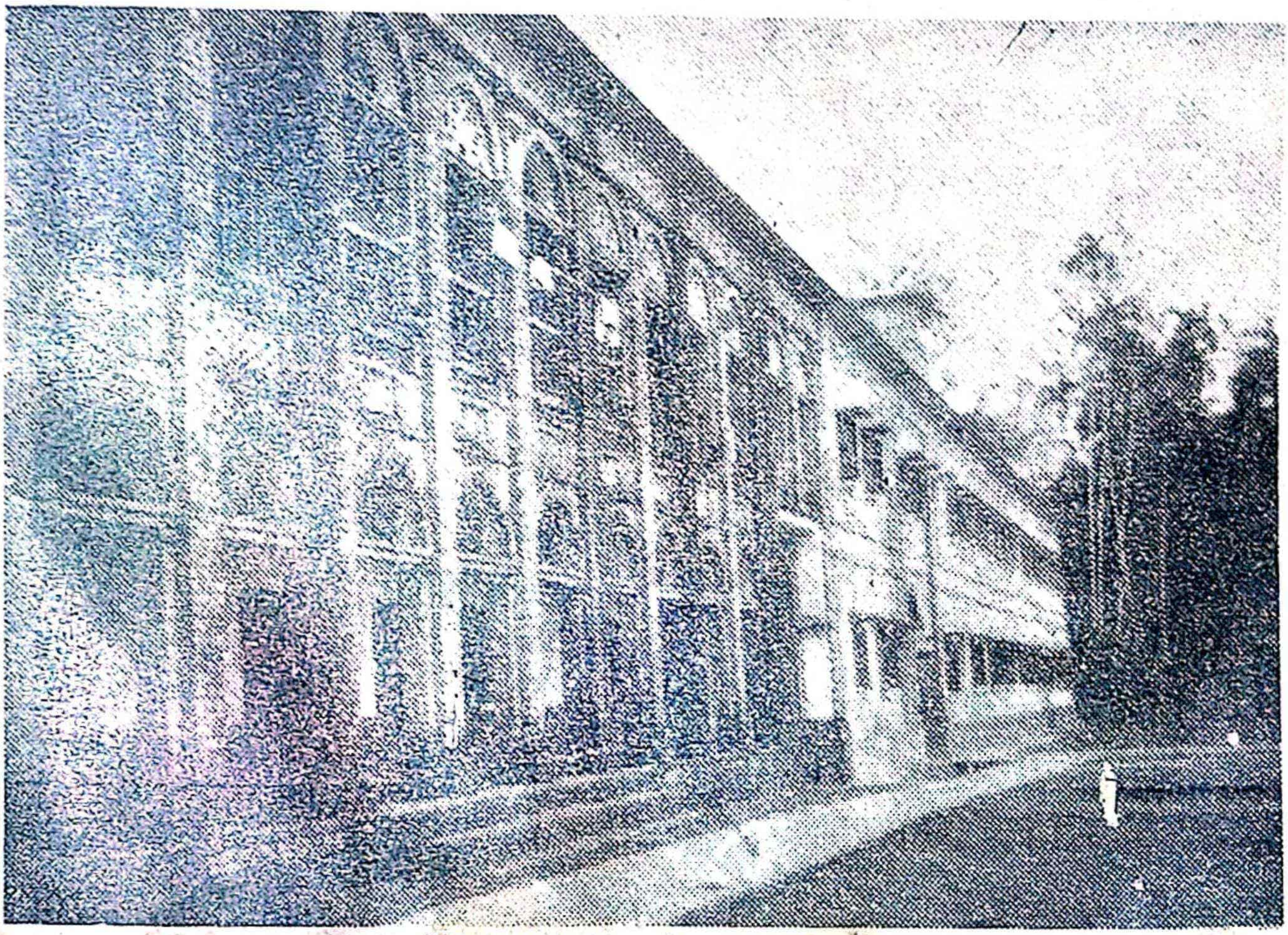
পীর ছাহেব কেবলার জীবন তাহা ছিল না। তিনি সারা জীবনই দুইদিকে জেহাদ চালাইয়াছেন। আল্লাহর প্রকৃত ওলীগণের জীবনের আদর্শ ও চরিত্র তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। এই জন্যই এই মনীষীর জীবনী বড়ো জটিল, বড়ো অতল-গভীর-স্পর্শিত।

যোগ্য হাতেই এই কাজের ভার অর্পিত হওয়া উচিত ছিল। যাঁহারা আমার ন্যায় ব্যক্তির হাতে এই বিরাট দায়িত্ব ছোপর্দ্দ করিয়াছেন তাঁহারা আমার প্রতি সীমাহীন স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র



মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ও তদীয় কনিষ্ঠ ছাহেবজাদার মাজার



ফ্রি-বোর্ডিংএর পশ্চাৎ ভাগের একাংশ সহ দারোল হাদীছ

ছীরতে নেছারিয়া

সূচনা

শর্ষিনার প্রসিদ্ধ পীর আলা হজরত মাওলানা শাহ আলহাজ্জ নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব আর ইহ দুনিয়ায় নাই। তাঁহার বিরাট জীবনের খ্যাতি পাক-ভারত ছাড়াইয়া সুদূর আরব দেশ ও মুছলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সুদীর্ঘ ও বিরাট কর্ম্মময় জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বিভাগ- পূর্ব্ব ও বিভাগোত্তর বাংলার ইছলাম প্রচার ও ইছলামের নব উত্থানের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। আমাদের যতদূর বিশ্বাস, বিগত এক শতাব্দীর ভিতরে এতদাঞ্চলে মরহুম পীর ছাহেবের ন্যায় একজন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবান সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে নাই। প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে শর্ষিনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু সংখ্যক দিনী মাদ্রাছা-স্থাপন, ইছলামী তালিমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, তরিকায়ে তাছাওফের ব্যাপক শিক্ষা দান,

শরীয়ৎ-বিরোধী কার্য্য কলাপ সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও উহার উচ্ছেদ সাধন, আলেম ও সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে অজস্র ধর্ম্ম প্রচারক ও হাদী তৈয়ার করা এবং ইছলামী পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রচার ইত্যাদি অসংখ্য কাজের ভিতর দিয়া তিনি যে-ভাবে ইছলামী জেন্দেগীকে রূপায়িত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত দাবী এতটুকু অতিরঞ্জিত মনে হইবার কারণ থাকিবে না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, পরিবেশ অনুকুল হইলে অতি বৃহৎ কাজও অল্পায়াসে সমাধা করা সম্ভব হয়, কিন্তু প্রতিকুল পরিবেশে ক্ষুদ্র কাজও পর্ব্বতের ন্যায় ভারী হইয়া পড়ে। বিরোধের সম্মুখেই শক্তি ও সাহসের পরিচয়। প্রকৃত মোজাহেদ ও সংগ্রামীর জীবনের মূল্য সেখানেই। মরহুম পীর ছাহেব যে যুগে তাঁহার কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে যুগে তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল একান্ত প্রতিকুল। সেই ঘোর প্রতিকুল পরিবেশ তাঁহার জীবন-সংগ্রামকে কঠিনতর করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় ঈমান, তাওয়াক্কোল ও সীমাহীন অধ্যবসায়ের গুণে তিনি প্রত্যেকটি বাঁধাকে অতিক্রম করিয়া পরিবেশকে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কঠোর সংগ্রামই দিয়াছে তাঁহাকে একটি অমর জীবন। মরহুম পীর ছাহেবের জীবনী আলোচনার পূর্ব্বে তাই তখনকার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে পাঠকগণের পক্ষে পীর ছাহেবের জীবনের কঠোর জেহাদ সম্পর্কে অনুধাবন করা সহজ হইবে।

তৎকালীন সামাজিক অবস্থা

বিগত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জন্ম হয়। সে সময়ে দেশ ইছলামী শিক্ষার দিক দিয়া গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইছলামিয়া মাদ্রাছার অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই হয়। বৃটিশ শাসনের বিষময় কুফল মুছলিম সমাজের উপর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি হিন্দু প্রধান্যের প্রভাব মুছলমান সমাজকে জাতীয় ও ধর্ম্মীয় প্রেরণা এবং আচার অনুষ্ঠান হইতে বহুদূরে নিয়া গিয়াছিল! আলেমের একান্ত অভাব ছিল। হেদায়েত ও তাবলীগ প্রায় ছিল না। নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাৎ প্রভৃতি ইছলামী হুকুম আহকাম লোকে ব্যাপক ভাবে তরক করিত। শরীয়তের হুকুম আহকামগুলির প্রচার ও আমল প্রায়ই ছিল না। মোছলমানী লেবাছ, পোষাক ও চাল-চলন লোকে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল। হিন্দু অনুষ্ঠান, উৎসব, পার্ব্বনাদি মোছলমান সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হাদী আলেমের সংখ্যা বিরল ছিল। বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা প্রভৃতি জিলার অবস্থা ইছলামী শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়া বড়ই নৈরাশ্য ব্যঞ্জক ছিল।

অবশ্য হাজী মরহুম শরিয়তুল্লাহ্ ছাহেব এবং তদীয় পরবর্ত্তী বংশধরগণ ফরিদপুর ও বরিশালের কোন কোনও অঞ্চলে ইছলাম প্রচার করেন। কিন্তু স্থায়ী কোনও দিনী শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁহাদের সেই প্রচার কোনও অগ্রগতি আনিতে

করেন। তাহার এন্তেকালের পরে তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ হেদায়েৎ তাবলীগের ধারা জারি রাখিয়া ইছলামের অশেষ খেদমৎ করেন। অবশ্য তাঁহাদের হেদায়েতের সুফল অঞ্চল বিশেষে বিশেষ কার্য্যকরি হইলেও আবার স্থান বিশেষে হেদায়েতের অভাবে ব্যাপক গোমরাহী ঘিরিয়া থাকিত। সুতরাং শেরক বেদাৎ প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুয়ানী আচার ব্যবহার মেলা পার্ব্বন, নৌকা-বাইছ, পূজা পার্ব্বনে পিঠে খাওয়া, তিথি-লগ্ন ও দিকশূল মান্য করা, দেব দেবীর নামে মানত করা ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের ইছলাম বিরোধী কার্য্য ও বিশ্বাস ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

অদ্যাবধি উক্ত মরহুম মাওলানা ছাহেবের বংশধরগণ হেদায়েত তাবলীগে রত রহিয়াছেন। এজন্য দেশবাসী মাওলানা মরহুম ও তাঁহার বংশধরগণের শোকরিয়া আদায় করিতে থাকিবে।

শর্ষিণা

বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানার অন্তর্গত শর্ষিণা একটি নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লী। আজ যদিও শর্ষিণা ইছলামী শিক্ষা ও নানা দিনী প্রতিষ্ঠানের একটি কেন্দ্র হিসাবে পাক ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত; কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন শর্ষিণা আর দশটি অজ্ঞাত পল্লীর ন্যায়ই একটি পল্লী ছিল। বহুকাল হইতে হিন্দূ মুছলিম উভয় শ্রেণীর

ইনি দীর্ঘদিন বাঁচিয়া ছিলেন। এই আবেদ ও দীনদার গ্রাম্য সরল প্রাণ জহীরুদ্দিন ছাহেবের ঔরষে মরহুম পীর ছাহেবের ওয়ালেদ জনাব হাজী ছদরুদ্দীন আহমদ ছাহেবের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে কোনও প্রকারে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ফারছি ভাষা পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান গ্রাম্য মাতবর এবং দীনদার লোক ছিলেন। তিনি গ্রাম্য বিচার ও সালিসীতে বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি বাহাদূরপুরের মরহুম হাজী জনাব ছুইজুদ্দিন মিয়া ছাহেবের শাগরেদ ভুক্ত ছিলেন। বরিশালের দক্ষিণাংশে মঠবাড়িয়া থানায় তাঁহার প্রচুর শাগরেদ ছিল। তিনি একজন হাদী লোক ছিলেন। তিনি গ্রামের সদ্বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রী অতিশয় নেককার, বুদ্ধিমতি, পর্দ্দা-নশীন ও ধৈর্য্যশীলা ছিলেন। ইনি বাংলা ১২৯৩ সনে হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমা গমন করেন। সেখানের পুণ্য-ভূমিতেই তাঁহার জীবনের অবসান ঘটে এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ হন।

পীর ছাহেবের জন্ম

উক্ত মরহুম মুন্‌শী ছদরুদ্দীন আহমদ ছাহেবের ঔরষে এক উন্নতমনা নেককার গ্রাম্য সরলা জননীর গর্ভে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলি ও মোজাদ্দেদ মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেবের জন্ম হয়। তাঁহার জনৈক সহপাঠী আজিও জীবিত আছেন।

বাঁধিয়া যাইত। গুরুমহাশয় উহা টের পাইয়া পীর ছাহেবকেই সাহায্য করিতেন এবং যাহারা জোর করিয়া মূর্ত্তি দেখাইতে চাহিত তাহাদের ধমকাইয়া দিতেন।

বাল্যে খেলা-ধূলা করে না এমন শিশু বিরল। খেলা-ধূলা মোটেই না করা যে একটা প্রশংসার বিষয় ইহা মনে করিবার হেতু নাই। পৃথিবীতে এমন মনিষী বিরল যারা উত্তরকালে মনিষী হইবেন বলিয়া শৈশব হইতেই খেলা-ধূলা ছাড়িয়া বড়ো হইবার সাধনা করিয়াছিলেন। বরং খেলা-ধূলা শিশু-সুলভ বৃত্তিরই পরিচায়ক এবং ইহা দেহ ও জীবন গঠনে বহু সহায়তা করে। প্রমাণ পাওয়া যায়, হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরলবী (রঃ) বাল্যে খেলা-ধূলা ও ব্যায়াম কুস্তিতে বিশেষ পটু ছিলেন। কিন্তু এই যে মনিষীর জীবনী আমরা এখানে আলোচনা করিতে বসিয়াছি বিচিত্র তাঁর শৈশব। তিনি তার সমপাঠী বা সমবয়সী বালকদের সহিত খেলা-ধূলা করিতেন না। তাই বলিয়া তিনি যে একদিনও কোনও কৌতুকজনক ক্রীড়ায় যোগদান করেন নাই এরূপ সংবাদ নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। তবে সচরাচর তিনি খেলা-ধুলা করিতেন না ইহাই তাঁহার শৈশবের ঘটনা। তিনি নিজেই একথা আমাদের নিকট উক্তি করিয়াছেন যে, তিনি পাঠশালায় ছেলেদের সহিত খেলিতেন না। কেন খেলিতেন না সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হয় নাই। তবে আমার ব্যক্তিগত অনুমান এই যে, পরবর্ত্তীকালে তাহাকে যেরূপ অসাধারণ গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দেখিয়াছি শৈশবেই

তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাঁহার শৈশবের আরও দু'একটি কথা যা শুনিয়াছি তাহা এই যে, তিনি না মিথ্যা বলিতে পারিতেন, না গাছে চড়িতে জানিতেন। মোটামোটি একটি নিরীহ স্থবির বালক হিসাবেই তাঁহার শৈশব আমাদের সামনে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। চঞ্চল উদ্দাম শৈশবই যে কেবল বিরাট ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে এ ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম দেখিতেছি। অবশ্য তাঁহার স্তব্ধ মৌন ও সরল শৈশবের ভিতরে হয়তো এই কথারই স্বাক্ষর ছিল যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ তাঁহাকে বাহিরের বিশাল পৃথিবী হইতেও বিশালতর এক ধ্যানলোকে লইয়া যাইবে। সে আহ্বান তার শৈশবেই আসিয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

তাঁহার বৈচিত্রহীন এই বিচিত্র শৈশব এইভাবেই অতিবাহিত হইল।

তখনকার মুছলিম বাংলার পল্লী! কি ছিল? মুছলমানের সামনে না ছিল কোনও আদর্শ, না ছিল কোনও প্রেরণা। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ধর্ম্ম ভাবাপন্ন পরিবারগুলির আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। তাই তারা ছেলেপেলেদিগকে ইংরাজী শিখাইতেন না। আরবী শিক্ষার তো কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। তাই অভিভাবকগণ পাঠশালায় কিছু শিক্ষা দিতে পারিলে তারপর এদিক সেদিক ভাবিয়া কোনও কেনারা করিতে না পারিয়া অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিতেন। আমাদের আলোচ্য জীবনীটীতেও এই ঘটনা ঘটিবার পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু কি

করিয়া তাঁহার জীবনে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল তাহা এই জীবনেতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উহা যথাস্থানে বর্ণনা করিব।

পিতৃ-বিয়োগ

পীর ছাহেবের সুখের শৈশব নানা দুর্য্যোগ ঘিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। পীর ছাহেবের বয়স চৌদ্দ বৎসরে উপনীত হইয়াছে। পিতা মরহুম হাজী ছদরুদ্দীন ছাহেব তখন হজ্বযাত্রার আয়োজন করিলেন। একমাত্র পুত্র রাখিয়া তিনি হজ্বযাত্রা করিতেছেন সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে হইল। প্রতিবেশী এক বিশিষ্ট পরিবারে পুত্রের বিবাহ দিলেন। ইহার পরে তিনি হজ্বে চলিয়া গেলেন। খোদার মরজী! মরহুম ছদরুদ্দীন ছাহেব আর ফিরিলেন না। তিনি সেখানেই এন্তেকাল করিলেন।

শিক্ষা ও জননী

পীর ছাহেব অকালে পিতৃহীন হইলেন। তাঁহার দাদা মরহুম তখন জীবিত। সুতরাং পীর ছাহেব পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। সংসার তদ্রূপ স্বচ্ছল ছিল না। কাজেই নানাদিক দিয়া জীবন শঙ্কটাপন্ন হইল। পীর ছাহেবের মহীয়সী জননী তখন বাঁচিয়া আছেন। তিনি সাহসে বুক বাঁধিয়া পুত্রের শিক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। এখন হইতে ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার নিভৃত পল্লী গ্রামের একটি সাধারণ পরিবারের মহিলা তাঁহার পিতৃহীন পুত্রকে উৎসাহ দিয়া এলম

শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করিতেছেন; এই প্রেরণা তাঁহার কোথা হইতে কিভাবে লাভ হইয়াছিল জানি না, কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই মহীয়সী নারী সাধারণের মধ্যে মহা শিক্ষিতা, সঙ্কীর্ণের মধ্যে বিরাট এবং বিপদের মধ্যে কর্ত্তব্য পরায়ণা ছিলেন। এই পিতৃহীন ছেলেকে যখন আমরা দেখি যে মায়ের উৎসাহে বিদেশে এলম শিখিতে যাইয়া পরিণামে তিনি আল্লাহর এক মহান অলিয়ে কামেল এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের আদর্শ ও পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন, তখন সুদূর অতীতের বাগদাদবাসিনী এক মহীয়সী জননীর কথা স্মরণ না করিয়া পারা যায় না। তিনিও একদিন তাঁহার পিতৃহীন পুত্র আবদুল কাদেরকে এলম শিক্ষার জন্যই স্নেহের আঁচল হইতে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই বালক 'গওছোল আজম' রূপে দুনিয়ার মুছলমানের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পথ-প্রদর্শক হিসাবে আজিও অমর হইয়া আছেন। বস্তুতঃ দুইটি ঘটনার মধ্যে সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধান সত্বেও একটি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

মাদারীপুর

ফরিদপুরের একটি প্রধান মহকুমা মাদারীপুর। মায়ের উপদেশ ও দোওয়া নিয়া তিনি বাড়ী হইতে এই প্রথম মাদারীপুর পড়িতে যান। সেদিনে বরিশালে কুত্রাপি একটি মাদ্রাছাহ ছিল না। মাদারীপুরের সন্নিকটে একটি প্রাথমিক ইছলামিয়া মাদ্রাছাহ্ ছিল। তিনি সেই মাদ্রাছায় ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে

তাঁহার একটি ব্যবহার। গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে বিপুল সমারোহ করিয়া তীরে নিবার জন্য পালকী নিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি সেদিন পালকী প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং পায়ে হাটিয়া তীরে উঠিলেন। তাঁর বাল্য ওস্তাদের দেশ, সেখানে তিনি কতো পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। আজো তিনি সেখানে যেন সেই বালকই রহিয়া গিয়াছেন।

পীর ছাহেবের বাল্য জীবনের আর একটি স্মৃতি যে বাঁচিয়া আছে তাহা হইল তাঁহার "মাওলানা ভাই"। তাঁহার ওস্তাদ মরহুম মাওলানা জনাব আলী ছাহেবের একমাত্র পুত্র মওলবী এছকান্দার আলী বি, এল। পীর ছাহেব পাঠ্য জীবনে তাঁহার এই ওস্তাদ ভাইটিকে কোলে কাঁখে করিয়াছেন। বয়েসের যথেষ্ট ব্যবধান, জীবন ধারার বৈষম্য ও নানাবিধ তারতম্যের ভিতরেও এই ওস্তাদ পুত্রটির প্রতি পীর ছাহেবের অগাধ স্নেহ দেখিয়াছি। ওস্তাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিই ছিল ইহার একমাত্র কারণ। পীর ছাহেবের ওস্তাদ-ভক্তি পরবর্তী জীবনে আরও গভীর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। যথাস্থানে আমরা উহা আলোচনা করিব।

তিনি শিক্ষার মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়ীতে আসিতেন। সংসারে মা ছিলেন ; মায়ের হুকুম তামিল করিতেন এবং সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিতেন। তিনি সময় মতো ওয়ালেদ মরহুমের সাগরেদগণের মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। মঠবাড়িয়া অঞ্চলে পিতা মরহুমের সাগরেদ ছিল। তাঁরা ওস্তাদ পুত্রকে গভীর মমতা

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাছার অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক শামছুল ওলামা জনাব মাওলানা মাজহার ছাহেব হুগলী মাদ্রাছায় পীর ছাহেবের সমপাঠী ছিলেন। তিনি আজিও বাঁচিয়া আছেন। মেধাবী, কৌতুকপরায়ণ ও বেজায় হাস্য-রসিক হিসাবে তিনি খ্যাত। পীর ছাহেব সম্পর্কে তিনি একদা উক্তি করিয়াছেন :— "বড্ডো ছুফী ছিল, খালি ঘরেই থাকতো আর পড়তো ; বড্ডো ভালবাসতাম ওঁকে। রাতে চুপি চুপি যেতাম, গিয়ে দেখতাম পড়ছে। আমি বাতি নিভিয়ে দিয়ে কৌতুক করতাম। ঢের উৎপাত করতাম, খাবার কিছু পেলে খেয়ে সাবাড় করতাম, কিন্তু এতো ভাল মানুষ ছিল যে, মোটেই রাগ হোতনা। ওঁকে আল্লাহ বড়ো নে'মত দিয়েছেন—আমার সমপাঠী না হ'লে ওঁর কাছে আমি মুরীদ হতাম।' পীর ছাহেবের রুচির বিরুদ্ধ হইলেও সমপাঠিদের এই উৎপাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। তেমনি আবার তিনি সমপাঠিদের সহিত যে কোনও ব্যাপারে জড়িত হইয়াও পড়িতেন না। বাহিরে সবার সঙ্গে কিন্তু ভিতরে নিজ কর্ত্তব্য নিয়া বহুদূরে অবস্থান করিতেন। এই কলিকাতায়ও তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। এখান হইতে তিনি গিয়া হুগলী মাদ্রাছায় ভর্ত্তী হন।"

প্রবরের পশ্চাদভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন। উক্ত মোরশেদ প্রবর নামাজের পরক্ষণে পশ্চাতে অপেক্ষমান লোকজনের দিকে ফিরিতেই এই তরুণ বয়স্ক ছাত্রটীকে দেখিতে পাইলেন। দীপ্তিময় সংযত চেহারা বিশিষ্ট এই তরুণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই বিজ্ঞ তাপসের মনে কি উদয় হইয়াছিল তাহা তিনিই জানেন। তিনি তখনই বলিলেন—"মুরিদ হবে বাবা!" কামেল সাধক ও তাপসগণ দীক্ষা দিবার জন্য কাহাকেও প্রায়ই আহ্বান করেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার ব্যতিক্রম ঘটিল। মোরশেদ নিজেই পশ্চাতে উপবিষ্ট তরুণকে মুরীদ হওয়ার জন্য অকুণ্ঠিতভাবে ডাক দিলেন। বিজ্ঞ তাপস তরুণের দীপ্ত ললাটে কোন স্বাক্ষর পাঠ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহা সেই তাপসই জানেন, কিন্তু সেদিনকার ঘটনা দ্বারা সেরূপ কিছু অনুমান করার পক্ষে যুক্তি রহিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের পীর ছাহেব সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন—"হুজুরের মেহেরবানী!" তাপস তাঁহাকে তখনই বয়াত করিলেন এবং 'কলব' মকামে ছবক দিলেন। এই ছবকের প্রতিক্রিয়া তরুণ শিক্ষার্থীর উপরে গভীর ভাবে পতিত হইল। মুরীদ প্রথম ছবকেই তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তরীকা-পন্থীগণের পক্ষে এই অবস্থা খুব সহজলভ্য নহে। দীর্ঘদিন একাগ্র সাধনা ব্যতীত এই উচ্চ শ্রেণীর অবস্থা লাভ করা সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত শিক্ষার্থীর প্রথম ছবকেই উক্ত অবস্থা হইয়াছিল। তিনি তরীকা গ্রহণের পক্ষে কতখানি অগ্রসর ছিলেন তাহা এই অবস্থা দ্বারা অনুমান করা যায়। পীর ছাহেব

নিজ মুখেই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তদীয় মোরশেদ তাঁহার এই অবস্থা টের পাইয়াছিলেন। এশার আজান হইয়াছিল, সকলে নামাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন কিন্তু তরুণ মূরীদ ইহার কিছুই টের পান নাই দেখিয়া তদীয় মোরশেদ বলিলেন—“উঠ বাবা, এশার আজান হইল।” এই কথায় তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। তিনি অপ্রস্তুতভাবে উঠিয়া গেলেন। ইহাই পীর ছাহেবের তরীকা গ্রহণের প্রথম দিনের ঘটনা।

সেদিনের মত কাজ শেষ হইল। পীর ছাহেব তদীয় মোরশেদ কেবলার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। বিদায়ের সময় মোরশেদ প্রবর তরুণ মুরীদটিকে বলিয়া দিলেন—“আমার সহিত আবার দেখা করিও।” পীর ছাহেবের জীবনে আকস্মিক ভাবে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল, ইহার পর হইতে তাঁহার জীবনে একটি নূতন ধারার সংযোগ হইল। তদীয় পীর ছাহেবের নির্দ্দেশ ক্রমে তিনি পুনঃ তাঁহার সহিত মোলাকাত করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর একদিন তিনি তাঁহার মোরশেদের সন্নিধানে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। তরুণ প্রাণের প্রজ্জলিত ইশকে এলাহীর স্বরূপ অনুধাবন করার শক্তি সকলের নাই। পীর ছাহেব কেবলার জবানী কয়েকবারই শুনিয়াছি, তিনি অশ্রুবিগলিত চক্ষে বলিয়াছেন—“হুগলী হইতে পীর ছাহেব কেবলার সহিত সাক্ষাতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম কিন্তু আজ দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই কথা স্মরণ করিতে পারি নাই যে, কি ভাবে আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম।” তিনি হুগলী হইতে পীরের সন্নিধানে কি ভাবে কলিকাতা গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবন-ভর একটি সমস্যাই রহিয়া গিয়াছিল। তিনি সেই ঘটনা স্মরণ করিতে পারেন নাই—হাঁটিয়া গেলেন, রেলগাড়ীতে গেলেন—না বায়বীয় পদার্থের সংগে মিশিয়া অলৌকিক উপায়ে কলিকাতা গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন তিনি এই সমস্যার সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। অবশ্য এই ঘটনার উপর আলোকপাত করা যায় এমন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই কাজেই ইহা আমাদের নিকটেও একটি পরম রহস্যরূপেই রহিয়া যাইবে। বিষয়টা স্মৃতি সম্পর্কীয়। কিন্তু হুগলী হইতে কলিকাতা যাওয়া একেবারে নিমেষের ব্যাপার ছিল না এবং তিনি তখন একেবারে বালকও ছিলেন না বরং রীতিমত যুবক ছিলেন, অথচ এই ছফরটি তাঁহার স্মৃতি হইতে বেমালুম নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলই বা কি প্রকারে! এক্ষেত্রে অনেকে অনেক কিছু কল্পনা করিতে পারেন বাঁধা নাই, কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত এই যে, পীর ছাহেব তখন তরীকার প্রথম স্তরে, এই অবস্থায় তাঁহার জজ্‌বা খুব বেশী হইত। হয়তো তিনি নির্দ্ধারিত পন্থায়ই কলিকাতা যাইয়া থাকিবেন কিন্তু মোরশেদে কামেলের ফায়েজের প্রভাব তাঁহার উপরে এরূপ গভীর ভাবে পতিত হইয়াছিল যে, একমাত্র তদীয় পীর কেবলার সংগে মোলাকাত করার খেয়াল ছাড়া অন্য কোন খেয়ালই সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার স্মৃতির উপর দাগ কাটিতে পারে নাই, কাজেই হুগলী-কলিকাতা ছফরটি পীর ছাহেব কেবলার জীবনের একটি ঘটনা হইলেও উহা তাহার স্মৃতি রাজ্যে স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

মোরশেদ ও মুরীদ

ইহার পর হইতে পীর ছাহেবের জীবনে একটি নূতন ধারা প্রবাহিত হইল। বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সমাপ্তি এখানেই ঘটিয়াছিল; কিন্তু তিনি আর একটি বৃহত্তর শিক্ষা ক্ষেত্রে আকস্মিক ভাবে প্রবেশ করিয়া বসিলেন। অতঃপর উহাই হইল তাঁহার জীবনের সাধনার বিষয়-বস্তু।

সংসার অভাবেরই ছিল। মা ছিলেন, পিতা মরহুম বহুদিন পূর্ব্বেই এন্তেকাল করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে চাকুরী ইত্যাদির সন্ধান করিতে হইত। তাঁহাকে রীতিমত সংসারী সাজিয়া সংসারের খেদমৎ করিতে হইত; কিন্তু কামেল মোরশেদের দৃষ্টি-মাত্র লাভ হওয়াতেই তিনি এক মহা জীবনের সন্ধান পাইলেন। কাজেই তিনি আর সকল দিক হইতে মোরশেদের সংগ-লাভ ও তরীকা শিক্ষাকে জীবনের মহান লক্ষ্য হিসাবে ধরিয়া লইলেন। মোরশেদের নিকট তিনি অল্পদিনেই খুব প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তদীয় মোরশেদ কেবলা তাঁহার ভিতরে এক অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। ফুরফুরা শরীফে তদীয় মোরশেদ কেবলার বাসস্থান এবং খানকাহ ছিল। তিনি কলিকাতায়ও সময়ে অবস্থান করিতেন। আমাদের পীর ছাহেব অতঃপর নিয়মিত ভাবে তদীয় মোরশেদের দরবার শরীফে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কখনও কখনও একাদিক্রমে

মাসাধিক কালও পীরের সাহচর্য্যে অবস্থান করিতেন এবং সেখানে থাকিয়া তরীকার ছবকাদি বিশেষ একাগ্রতা সহকারে গ্রহণ করিতেন। আবার তিনি পীর কেবলার নির্দ্দেশ মতই বাড়ীতে আসিতেন। সংসারে বৃদ্ধা জননী ছিলেন, স্ত্রীও ছিলেন, বিবাহ বাল্যকালেই হইয়াছিল, কারণ ওয়ালেদ মরহুম হাজী ছদরুদ্দীন আহমদ ছাহেব হজ্জ যাত্রা কালে এক মাত্র পুত্রকে অবিবাহিত রাখিয়া যাওয়া সমীচীন মনে করেন নাই। কাজেই পুত্রের বিবাহ কার্য্য সমাধা করাইয়াই তিনি হজ্জে গিয়াছিলেন। সুতরাং সংসার রীতিমতই ছিল। একদিকে সংসার, অন্যদিকে কামেল মোরশেদের সাহচর্য্য এবং আত্ম গঠনের দুর্গম সাধনায় তিনি নিজের জীবন ব্যপৃত করিয়া রাখিলেন। তদীয় পীর কেবলা তরুণ বয়স্ক সাগরেদের সংসারিক দায়িত্ব এবং বৃদ্ধা মাতার কথা জানিতেন। বৃদ্ধা জননী কতদিনের জন্য পুত্রকে বাহিরে থাকিবার অনুমতি দিতেন ইহা বিজ্ঞ মোরশেদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেন। সময় অতীত হইলে তিনি নিজেই তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিতেন। এই ভাবে তিনি সাগরেদকে জীবনে এক বিরাট দায়িত্ব বহনের জন্য ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

অল্পদিন যাইতে না যাইতেই মোরশেদে কামেল তদীয় সাগরেদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন এবং লোকদিগকে বয়াত করার এবং তালীম দিবার নির্দ্দেশ ও খেলাফত দান করিলেন। এই প্রসংগে পীর ছাহেব বলিয়াছেন যে, তিনি

আদব-আখলাক, ছালাম-কালাম, চাল-চলন, লেবাছ-পোষাক কচিৎ ও কদাচিৎ দেখা যাইত। ঝগড়া কলহ খুন জখমী, বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মামলা মোকদ্দমা, হিংসা বিদ্বেষ ও দলাদলী দেশের অজ্ঞ জন-সাধারণের ভিতরে অভিশাপের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। অন্যদিকে হিন্দুয়ানী আচার অনুষ্ঠান ও চালচলন মুছলমানগণ ক্রমান্বয় নিজেদের ভিতরে গ্রহণ করিয়া লইতেছিল। পূজা পার্ব্বনে অবাধ যাতায়াত, মেলা-খোল ও তদুপলক্ষে নৌকা বাইছ, গান বাজনা ইত্যাদি সকলই মুছলমান নির্ব্বিবাদে আপনার করিয়া লইতেছিল। আল্লাহ্‌র ফরজ, রছুলুল্লাহ্‌র ছুন্নৎ, ইছলামী জিন্দেগীর আদর্শ ও মহান শিক্ষা হইতে মুছলমান সমাজ একেবারেই গাফেল হইয়া পড়িয়াছিল। কচিৎ ও কদাচিৎ দুই চারিজন আলেম বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহারা দেশের এই ভিতরকার গলদ দূর করিতে সমর্থ না হওয়ায় দেশের জন্য ইহা এক মারাত্মক ক্ষতিকর জিনিস হইয়াছিল। তাঁহারা ওয়াজ করিতেন, আদর যত্ন প্রচুর লাভ করিতেন কিন্তু ইহাতে দেশের এই মারাত্মক ব্যাধির উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিকার হইত না। এই সকল অবস্থা অবলোকন করিয়া পীর ছাহেব বড় উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হইলেন। তাঁহার দূরদর্শী মোরশেদে কামেল কেন যে তাঁহাকে এই সুকঠিন ব্রতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি তখন হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি হেদায়েত জীবনে যে অসাধারণ কাজ করিয়া দেশের গোমরাহী দূর করতঃ ইছলামের শিক্ষা সৌন্দর্য্য, আল্লাহ ও রছুলের তাবেদারী প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বিস্তৃত অধ্যায়ে উহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বসন্ত রোগে

এই সময় পীর ছাহেবের জীবনে একটি কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইল। তিনি হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন্। জীবন বিপন্ন বলিয়া মনে হইল। দীর্ঘ দিন ভুগিয়া তিনি এই কঠিন রোগ হইতে আল্লাহ্র অসীম করুণা বলে মুক্তি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু রোগের ভীষণ আক্রমণ পীর ছাহেবের অঙ্গে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গেল। এই ব্যাধিতে নাকের অগ্রভাগের একাংশের খানিকটা খসিয়া গিয়াছিল। কণ্ঠনালীর ক্ষুদ্র মাংস খণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। জিহ্বা ভীষণভাবে জড়তা প্রাপ্ত হইল। এমন কি পূর্ব্বেকার মত সুতীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট কণ্ঠস্বর আর থাকিল না। তিনি প্রথম অবস্থায় অতি ধীরে ধীরে বিশেষ আড়ষ্টতার সঙ্গে কথা উচ্চারণ করিতেন। পীর ছাহের্ নিজেই বলিয়াছেন যে, "আমি 'আকলম' (পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম) এই সোজা শব্দটীও উচ্চারণ করিতে পারিতাম না।" ডান হাতের কব্জা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল্। তিনি কলম ধরিতে এবং লিখিতে বিশেষ বেগ পাইতেন। লিখিতে গেলে অক্ষরগুলি আকাবাঁকা হইয়া যাইত। দুরন্ত ব্যাধি পীর ছাহেবের অংগে এই সকল স্থায়ী প্রতিক্রিয়াগুলি রাখিয়া গেল। সর্ব্বোপরি কণ্ঠস্বর ও কথা অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় বড়ই দুঃখের কারণ হইয়াছিল। রোগ মুক্ত হইয়া তিনি মোরশেদ সন্নিধানে গেলেন। মোরশেদ তাঁহার প্রিয় সাগরেদটির এহেন অবস্থা দেখিয়া বড়ই আক্ষেপ করিয়াছিলেন। পীর ছাহেব ইতি পূর্ব্বেই মক্কাশরীফ যাওয়ার সংকল্প করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মক্কাশরীফ যাওয়া আসন্ন জানিয়া তদীয় মোরশেদ তাঁহাকে জিহ্বার জড়ত্ব দূর হইবার জন্য মকামে জিব্রাঈলের সম্মুখস্থ পবিত্র কাবা গৃহের সংলগ্ন একখানা বিশেষ পাথর লেহন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। পীর ছাহেব মক্কাশরীফ যাইয়া তদীয় পীর কেবলার উপদেশ মত তাহাই করিয়াছিলেন। আল্লাহ্র মর্জ্জী, ইহার আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছিল। ক্রমান্বয়ে কণ্ঠস্বর অনেকাংশেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে এই জড়তা অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল।

মক্কাশরীফে হেজ্‌রতের নিয়ত

রোগাক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই পীর ছাহেব পবিত্র মক্কাশরীফে হেজরত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। জীবনের এই স্তরে তিনি আল্লাহতালার গভীর এশকের জজবাতে আকৃষ্ট ছিলেন। কাজেই তিনি দেশের সর্ব্বত্র শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ ও আল্লাহ্‌ নাফরমানী দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আশংকা করিয়াছিলেন যে, এই ব্যাপক নাফরমানীর মধ্যে ঈমান বাঁচাইয়া চলা দুষ্কর হইবে। তাই হয়তো তিনি মক্কাশরীফ হেজরতের মোটামোটি সংকল্প করিয়াছিলেন। রোগমুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্পিত হেজরতের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মাতা, স্ত্রী অল্প বয়স্ক পুত্র আবদুল মান্নান এবং ভগ্নিপতি মরহুম হাফেজ হাজী আবদুর রশীদ ছাহেবকে সংগে লইয়া তিনি হেজরতের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর হইয়া জাহাজ যোগে পবিত্র মক্কাধামে চলিয়া গেলেন। অবশ্য তিনি হেজরতের পূর্ণ সংকল্প করিয়াছিলেন না। যদি থাকা সম্ভব না হইয়া উঠে তবে হয়তো পুনরায় ফিরিয়াও আসিতে পারেন নিয়ত এইরূপই করিয়াছিলেন। সেই জন্য নিজ জায়গা, বাড়ীঘর সব অপর এক ভগ্নিপতির হাওয়ালা করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মক্কাশরীফ পৌছিয়া অস্থায়ী বাসা ভাড়া করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিলেন। আল্লাহুর মর্জ্জি, বাংলার একটি বৃহত্তর খেদমত যাহার জন্য আল্লাহুর তরফ হইতে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে আল্লাহ তাহাকে সেইখানেই

নিয়া আসিবেন, ইহার ব্যতিক্রম কে করিবে? কাজেই ঘটনার চাকা সেই পথেই ঘুড়িতে লাগিল। সেখানে কিছুদিন যাইতে না যাইতে স্ত্রী ও পুত্র এন্তেকাল করিলেন। অতঃপর মাতা ছাহেবার পরামর্শে হজ্জ-সমাপনান্তে তাঁহাকে নিয়া পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পুনরায় স্বদেশে

পীর ছাহেব কেবলা পবিত্র মক্কা শরীফ হইতে মাতা ছাহেবাকে নিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর নিজ পীরের সন্নিধানে চলিয়া গেলেন। দীর্ঘদিন পরে মোরশেদ ও মুরীদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটায় পরস্পরে পরম আনন্দিত হইলেন। মোরশেদ স্বীয় ভক্ত মুরিদকে দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হইলেন। অতঃপর পীর ছাহেব কেবলা পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক জীবন আরম্ভ করিলেন। বৎসরে বহুবার তিনি নিজ মোরশেদের নিকট গমন করিতেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করতঃ তরিকা শিক্ষা করিতেন এবং পীরের খেদমত করিতেন। তিনি তাঁহার নিকট কেবল যে, তরিকার ছবক গ্রহণ করিতেন তাহাই নহে বরং জীবনের ছোট খাট বিষয়গুলি এবং লোকগণকে হেদায়েত করিবার প্রণালী সমূহ একান্ত অবোধ বালকের মতো শিক্ষা করিতেন। আবার দেশে ফিরিয়া আসিলে সংসারের খেদমত করিতেন। সময় মতো ছফরে বাহির হইয়া পড়িতেন। খুব

বেশী দূরে নহে, মঠবাড়িয়া থানায় পিতা মরহুমের সাগরেদানের মধ্যে। সেখানের আদর যত্ন ছিল। আলেম ও ওস্তাদপুত্র হিসাবে তিনি প্রচুর ভক্তি ও সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ শরীয়ত ও মারেফতের প্রতি বিশেষ একাগ্রতা ও লোকদিগকে আল্লাহর তাবেদারীতে অভ্যস্ত করাইবার ঐকান্তিক চেষ্টা লোকের আরও অধিক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তাবলীগী জীবনের প্রথমে এই কেন্দ্রটুকু তাঁহার বড়ো প্রয়োজনে আসিয়াছিল। এইখানে তিনি তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করিবার একটি ক্ষেত্রে লাভ করিলেন। প্রতি বৎসর কিছু সময় এইভাবে হেদায়েত উপলক্ষে বাহিরে অবস্থান করিতেন। অবশিষ্ট সময় তিনি বাড়ীতে ও পীরের দরবারে কাটাইয়া দিতেন।

সমস্যার সম্মুখে

তখনকার দিনে পীর ছাহেবের নিজ গ্রামেও পার্শ্ববর্ত্তী এলেকায় বে-জুমা পন্থীগণের প্রাধান্য ছিল। ফরিদপুরের হাজী মরহুম শরিয়ৎ উল্লাহ ছাহেবের বংশধরগণ এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। পীর ছাহেবের জন্ম-ভূমি ও তাঁহার আসে-পাশে কোথাও একখানা জুমা মছজিদের অস্তিত্ব ছিল না। পীর ছাহেবের দাদা এবং ওয়ালেদ মরহুম জুমার নামাজ পড়িতেন না। বরং তাহারা এই সম্প্রদায়ের স্থানীয় খলিফা তুল্য ছিলেন। আমাদের পীর ছাহেবও এযাবৎ

জুমার নামাজ পড়েন নাই। মুরিদ হওয়ার পরেও তিনি জুমার নামাজ পড়িতে অভ্যস্ত হন নাই। এমন কি তাঁহার পীর কেবলা পাকা জুমাপন্থী হওয়া সত্বেও তিনি নিজ পীরের বাড়ীতেও জুমার নামাজ পড়িতেন না। ইহাতে সেখানে অন্যান্য মুরিদ ও খলিফাগণের মধ্যে কানাঘুষা চলিত—সময়ে তর্ক বিতর্কের উপক্রম হইত। কিন্তু পীর ছাহেবের বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মোরশেদ এই বিষয়ে কোনই উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন না। বরং এই বিষয় যাহারা কানাঘুষা করিতেন এবং তর্ক করিতে উদ্যত হইতেন তাহাদিগকেই তিনি সাবধান করিয়া দিতেন যে, তোমরা কেহই এই বিষয় নিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিও না। সে পাকা হানাফী ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না"। ইত্যাদি। আমাদের পীর ছাহেব তদীয় পীরের এইসব উক্তি শুনিয়া জুমা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—আমার পীর আমাকে একজন পাকা হানাফী বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, অথচ আমি জুমার নামাজ পড়িতেছি না, আর পীর ছাহেব স্বয়ং জুমার নামাজ পড়িয়া আসিতেছেন তবে তিনি কি হানাফী মজহাব বহির্ভূত?" এই চিন্তা করিয়া তিনি প্রতদ্দেশে জুমার নামাজ পড়া সম্পর্কে দলীল প্রমাণ বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমান্বয়ে এই দেশে জুমার নামাজ পড়ার অপরিহার্য্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মোরশেদ কেবলার নিকট জুমার নামাজ পড়িবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন। তদীয়

বিচক্ষণ মোরশেদ তাঁহাকে জুমার মছজিদ যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই মাত্র পড়িয়া লইবার অনুমতি দিলেন এবং তখনকার মত বাড়ীতে জুমার মছজিদ প্রতিষ্ঠা করিতে বারণ করিয়া দিলেন। বিজ্ঞ মোরশেদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুরীদ পুরুষানুক্রমে বে-জুমাপন্থী ওলামাগণের খলীফা, সুতরাং দেশে যথেষ্ট জুমা-ওয়ালা তৈয়ার না হওয়া পর্য্যন্ত জুমার মছজিদ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে হয়তো ভীষণ বিরোধিতার মোকাবেলা করিতে হইবে। ইহাতে কার্য্যতঃ হেদায়েতের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য তিনি তখনকার মত পীর ছাহেবকে নিজ বাড়ীতে জুমা প্রতিষ্ঠা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরে পীর ছাহেব স্বীয় পীরের নির্দ্দেশ মতে জুমার নামাজ পড়িবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন। পীর ছাহেবের সংগে বহুলোক জুমার নামাজ পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তিনি যেদিন প্রথম জুমার নামাজ পড়িলেন সেই দিন প্রায় সাড়ে তিনশত মুছল্লী তাঁহার সংগে একত্রে জুমার নামাজ আদায় করিলেন। এই ঘটনায় দেশে বে-জুমাদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিল। জুমা বিরোধীগণের প্রধান ব্যক্তিরা ইহাকে একটি গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। দেশে দুইটী শ্রেণীর অস্তিত্ব জাগিয়া উঠিল। কিন্তু পীর ছাহেবের অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার ও পরম ধৈর্য্যশীলতার গুণে দেশে দুইটি মতের অস্তিত্ব জাগিয়া উঠিলেও কোন প্রকার বিরোধিতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষ ঘটিতে পারে নাই।

জীবনে বরিশাল ও ফরীদপুরের ব্যাপক অঞ্চলে জুমা প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম খেদমত। সহস্র সহস্র লোক পীর ছাহেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জুমার নামাজে অভ্যস্থ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, কত সংখ্যক মছজিদ যে পীর ছাহেব ও তাহার অনুসরণকারীগণের দ্বারা এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মরহুম মওলানা কারামত আলী জোনপূরী ছাহেব জুমা সম্পর্কে এদেশে আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে পীর ছাহেবের হাতেই ইহা স্বার্থকভাবে সফলতা লাভ করিয়াছে।

প্রথম অবস্থায় জুমার ব্যাপার লইয়া পীর ছাহেবকে বিশেষ বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অনেক স্থলে বাহাছ ও মোনাজেরা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, বাহাছ ও মোনাজেরা দ্বারা সত্য নিরূপণ হওয়ার স্থলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, ও আত্ম-কলহই সৃষ্টি হয়, তখন তিনি এই পন্থা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি জুমা সম্পর্কিত মছলা-মাছায়েল বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। জুমা সম্পর্কে কেহ জিজ্ঞাসু হইলে তাহাকে হয় কেতাব পাঠ করিয়া উহার তরজমা শুনাইয়া দিতেন, নতুবা লিখিত কেতাব পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেন; প্রতিপক্ষের অজস্র বিদ্রুপাত্বক ও বিদ্বেষমূলক মৌখিক ও লিখিত আক্রমণ সমূহের কোনই প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিতেন না। কেবল

মাত্র জুমা সম্পর্কিত সত্য মছলা ও দলীল সমূহ প্রচার করিয়াই চলিতেন। বরং বহু স্থলে প্রকাশ্য সভাসমিতিতে প্রতিপক্ষের আক্রমণমূলক কার্য্যাবলীর জন্য তিনি অত্যন্ত সহজ ও সরল মনে ক্ষমা করিয়া দিতেন। সংগীসাথীগণের বা নিজ অনুবর্ত্তী-গণের মধ্যে কেহ যদি মনে ব্যথা পাইয়া প্রতিশোধ মূলক কোন বাক্য উচ্চারণ করিতেন বা লিপিবদ্ধ করিতে চাহিতেন, তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে তাহাকে বাঁধা দিতেন এবং কিছুতেই এই পথে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। এই উদার মনোভাব, মানুষের প্রতি মর্য্যাদাবোধ এবং শান্তিপ্রিয়তাই মানুষকে জুমা সম্পর্কে বিচার করার সুযোগ দান করিয়াছিল। সুতরাং পীর ছাহেব জুমা সম্পর্কে দলগত মনোভাব লইয়া প্রচার না করিলেও তাঁহার চরিত্র মাহাত্ম্যে এবং তাকওয়া-পরহেজগারী দর্শনে লোক এরূপ মুগ্ধ হইয়া যাইত যে তাহারা আপনা হইতেই দলে দলে জুমার নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পীর ছাহেবের ন্যায় ব্যক্তি যখন জুমার নামাজ পড়িতেছেন বহু লোকের পক্ষে উহাই অবিসংবাদিত দলীল বলিয়া বিশ্বাস হইত। এতদস্বত্বেও প্রতিপক্ষের চাঞ্চল্য ও বিরুদ্ধ প্রচারের অন্ত ছিল না।

পীর ছাহেব দেখিলেন, জুমা সম্পর্কে অশিক্ষিতগণকে দলীল প্রমাণ দিয়া বুঝান এক পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং তিনি পরবর্ত্তী জীবনে একটি সুদূর প্রসারী কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিলেন। উহাই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জুমা

সমস্যার চরম সমাধান ও উত্তর। তিনি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশে দীনি এলেম বিস্তার করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। আলেম মাত্রই তাহার নিজ আত্মীয় পরিজনকে আল্লাহ্‌র রাস্তা চিনাইবে। এইভাবে জুমার বিরোধ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে। এই সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা লইয়া তিনি কাজ আরম্ভ করিলেন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এলমেদীন শিক্ষার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কেবল জুমার জন্যই নহে, আল্লাহকে চিনিতে এবং ইছলাম অনুসরণ করিতে এলমেদীনের অপরিহার্য্যতা সবক্ষেত্রেই রহিয়াছে। একমাত্র এলমেদীনই দেশের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক সকল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম। সুতরাং তিনি দীনি এলেমের মাদ্রাছাহ্ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি দীনি এলেম শিক্ষার মাদ্রাছা, এলমে-শরীয়ত ও এলমে-মারেফত প্রচারে নিরবছিন্ন ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে জীবন শেষে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সম্মুখে যেমন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শর্ষিণা আলীয়া মাদ্রাছার ন্যায় দীনি এলেমের একটি অদ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তেমনই বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, খুলনা ও নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শতাধিক দীনি মাদ্রাছাহ্। বস্তুতঃ তাঁহার সংগ্রামের বিরাট সাফল্য তিনি নিজ জীবনের প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া দেখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। জুমা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে ঝগড়া কলহ করিয়া দেশের শান্তি ব্যাহত করিতে হয় নাই। এলমেদীনের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠাদ্বারাই উহার সুষ্ঠু সমাধান হইয়া গিয়াছে। এলমে-শরীয়ৎ ও মারেফত প্রচার করিতে যাইয়া তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠান শর্ষিণায় এবং বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া তুলিয়াছেন যথাস্থানে আমরা উহার পরিচয় দিব।

কর্ম্মের প্রসার

এখন হইতে পীর ছাহেবের জীবনে কর্ম্মের প্রসারতা লাভ করিল। তিনি হেদায়াত ও তাবলীগকেই জীবনের প্রধান কর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করিলেন। এই জন্য তাঁহার জীবনে সর্ব্ব প্রকার প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। তিনি তরীকার উচ্চস্তান আহরণ করিবার জন্য নিজকে তদীয় কামেল মোরশেদের হাতে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিলেন। ক্রমান্বয়ে নক্‌শাবান্দিয়া, মোজাদ্দাদিয়া, চিশতিয়া ও কাদেরিয়া ছেলছেলায় ছলুক উত্তীর্ণ হইলেন। অন্যদিকে হেদায়াত ও তাবলীগের কাজেও বিশেষ জোর দিলেন। তাঁহার জীবনধারা অতঃপর একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী অনুসরণ করিয়া প্রবাহিত হইল। তিনি প্রথমতঃ নিজ জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে হেদায়াত উপলক্ষে আহুত হইতে লাগিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি পায় হাটিয়াই ছফর করিতেন। সংগে বহুসংখ্যক লোকজন থাকিতেন। যেখানে উপস্থিত হইতেন সেস্থান গোলজার হইয়া যাইত। তাঁহার প্রভাব ও

প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়াতে কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্র লোকের ভিতরে সাড়া পড়িয়া যাইত। তাঁহার আগমন উপলক্ষে সভার অনুষ্ঠান হইত। তিনি সভায় ওয়াজ নছীহত করিতেন। উহা কেবল মামূলী ওয়াজই ছিল না; দেশের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সকল গলৎ প্রবেশ করিয়া ইছলামের বুনিয়াদ ধ্বংসপ্রায় করিয়া দিতেছিল উহার এক একটিকে তিনি হাতে ধরিয়া শোধরাইতেন। বেনামাজীদিগকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করিতেন। সুদখোর, ঘুষখোর, গান বাজনা শ্রবণকারী ও ভণ্ড বেদায়াতী ফকীরদিগকে বিশেষভাবে হেদায়াত করিতেন। শরীয়তের মামলা-মোকদ্দমা প্রচুর আসিত। বড় বড় সুদখোর যাহারা সুদের দেনার দায় গরীবের ভিটা মাটি উৎপন্ন করিয়া দিত তাহাদের বিরুদ্ধে খাতকগণ শরীয়তি মামলা দায়ের করিত। পীর ছাহেব সুদী মহাজনকে তলব করিতেন ও তাহার দলীল তলব করিতেন এবং শরীয়তের বিচার অনুযায়ী সুদের সমুদয় টাকা খাতককে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। কেহ বা সহজেই অনুরোধ মান্য করিয়া খাতকের টাকা ফিরাইয়া দিত এবং দলীল শুদ্ধ করিয়া লইত। কেহ বা সহজে ফিরাইয়া দিতে চাহিত না; পীর ছাহেব তাহাকে ভালরূপে শরীয়তের কথা শুনাইতেন, আল্লাহ্র ভয় ও দোজখের আজাবের কথা শুনাইতেন। ইহাতেও বহুলোক হেদায়াত হইয়া যাইত। এইরূপে শত শত খাতককে সুদখোরের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্র রাস্তায় টানিয়া আনিতেন। আবার

কেহ সুদের মোহ সহজে ত্যাগ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইতেন। ক্রমাগত কয়েকদিন সংগে রাখিতেন, তিনি অগত্যা ধমক দিতেন, সমাজবদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেন, সময়ে সমাজবদ্ধ করিয়াও তাহাদিগকে আটক করিতেন। এইভাবে তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে আনিতেন। বেনামাজীদিগকে শায়েস্তা করিতেন ও অপরাধ অনুযায়ী শাসন করিতেন। কাহাকেও জুতা পেটা পর্য্যন্তও করিতেন কিম্বা দোর্‌রা লাগাইতেন। গান বাজনাকারী ও শ্রবণকারী, মেলাথোলে যোগদানকারী, নৌকা বাইছ ও ঘোড়দৌড় দেনেওয়ালা প্রভৃতির বিরুদ্ধে শরীয়তের মামলা আসিত। তিনি অপরাধ অনুযায়া বিচার করিতেন, তওবা করাইতেন ও নেকাহ দোহ্‌রাইয়া দিতেন। মোট কথা, তাঁহার সম্মুখে যেন বিরাট আদালত বসিয়া যাইত। পীর ছাহেব দরখাস্ত গ্রহণ করিতেন, সমন জারী করিতেন, পেয়াদা মহরী থাকিত, সাক্ষী প্রমাণ হাজের করিতেন, কখনও বা নিজেই মোকদ্দমার তদন্তে নামিয়া যাইতেন। সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ ইনছাফ করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতেন। এইভাবে দিনের পর দিন বিচার মীমাংসা করিতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিচার আচার করিতেন। ইহার ভিতর দিয়া তিনি নামাজ, জমাত, আজান, একামত, কলেমা কালাম, হালাল হারাম ও পর্দ্দা পুসিদার শিক্ষা বিস্তার করিতেন।

এইভাবে তাঁহার এরূপ প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল যে, তিনি কোনও গ্রামে উপস্থিত হইলে বেনামাজীগণ ও যাহারা নামাজের

ছুরা কেরাৎ ইত্যাদি জানিত না তাহারা পালাইয়া দূরে যাইয়া আত্মরক্ষা করিত। তাহারা ভয় করিত যে পীর ছাহেব নামাজের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, বলিতে না পারিলে জুতা খাইতে হইবে নতুবা সমাজ-বন্ধ থাকিতে হইবে। সুতরাং তাহারা গোপনে গোপনে মছলা ও দোওয়া কালাম শিখিয়া আসিয়া পরে পীর ছাহেবের সঙ্গে দেখা করিতেন। এইরূপ আন্তরিক একাগ্রতা লইয়া তিনি দেশবাসীকে গোমরাহীর অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইলেন। পীর ছাহেবের হেদায়েৎ সম্পর্কিত বহু ঘটনা আছে। এখানে দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

একবার মঠবাড়িয়া অঞ্চলে এক মাতবরের বাড়ীতে পীর ছাহেবের দাওয়াৎ হইল। পীর ছাহেব অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মহাজনের সুদী দলীল আছে। পীর ছাহেব মহাজনকে বলিলেন "আপনি সুদ হইতে পরিস্কার না হইলে আপনার দাওয়াৎ খাইতে পারি না এবং অন্যান্য লোকদিগকেও খাইতে হুকুম দিতে পারি না।" মহাজন মৌখিকভাবে সুদ পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করিলেন। পীর ছাহেব বলিলেন, —হিসাব করিয়া সমুদয় টাকা আমার নিকট আমানৎ না করিলে আমি খানা খাইতেও অন্যকে আদেশ দিতে পারি না।

অগত্যা মাতবর টাকা জমা করিলেন। পীর ছাহেব লোকদিগকে খানা খাইতে আদেশ দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে মাতবর পীর ছাহেবের নিকট আসিয়া টাকা ফেরত

চাহিলেন। পীর ছাহেব বলিলেন, "কেন, ইহা তো খাতকের টাকা। ইহা খাতকদিগকে ডাকিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে।" মাতবর ইহাতে অসম্মত হইলেন। পীর ছাহেব বলিলেন,— "আপনি শরিয়ৎ মানেন কিনা? মূর্খ মাতবর গায়ের অহঙ্কারে বলিয়া বসিল—"না আমি শরিয়ৎ মানি না"। পীর ছাহেব তাঁহার কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া বলিলেন, "দিন, দস্তখত দিন", মাতবর অমনি দস্তখত করিয়া দিলেন। পীর ছাহেব মাতবরের টাকা সজোরে ভূ-তলে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং দাঁড়াইয়া মাতবরকে এক পদাঘাতে ভূতল-শায়ী করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বিশেষ জজ্‌বার সহিত "মরদুদ, বেইমান, খবিছ" ইত্যাদি শব্দে দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ভৎ‌র্সনা করিলেন। পরক্ষণে পীর ছাহেব সঙ্গী-সাথী সহ সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মাতবরকে সমাজ-বন্ধের ফতোয়া দিলেন।

"যেহেতু মাতবর শরিয়ৎ মানেনা বলিয়া কেবল মৌখিক উক্তিই করে নাই বরং দস্তখতও করিয়াছে। সুতরাং সে শরিয়ৎদ্রোহী, তাঁহার নিকাহ বাতিল হইয়াছে। তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার আদান প্রদান, খাওয়া-দাওয়া বিবাহ সাদী, এমন কি বেচা-কেনা ও নাপিত-ধোঁপা পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে হইবে।" এই ফতোয়া প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতবরের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হইয়া পড়িল। এমন কি নাপিত পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্ষৌরী করিতে অস্বীকার করিল। মাতবর নাপিতকে ক্ষৌর কার্য্যের জন্য ডাকিলে সে এই বলিয়া দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল যে, "পীর

ছাহেব আপনাকে সমাজ-বদ্ধ করিয়াছেন, আপনাকে আমি ক্ষৌরী করিলে আমার হাতে আর কেহ ক্ষৌরী হইবে না।"

সুদখোর মহাজন তরুণ-বয়স্ক পীরের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া একেবারেই জব্দ হইয়া গেল এবং পীর ছাহেবের নিকট যাইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল—"হুজূর, আপনি সার্থক পীর, আপনি বয়সে আমার নাতী সমতুল্য, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি তওবা করিতেছি।" পীর ছাহেব অতঃপর তাঁহাকে তওবা করাইয়া এবং বিচারের হুকুম দিয়া সমাজ-বদ্ধ প্রত্যাহার করিলেন।

আর একটি ঘটনা এই যে, এক ব্যক্তি তাঁহার মাকে প্রহার করিয়াছিল। পীর ছাহেবের নিকট ইহার নালিশ আসিল। পীর ছাহেব তাহাকে তলব দিয়া আনিয়া সাক্ষী প্রমাণ লইয়া ঘটনা প্রমাণ করিলেন। অতঃপর পীর ছাহেব আসামীকে প্রহার করিতে সঙ্গীয় পেয়াদাকে নির্দ্দেশ দিলেন। প্রহারে সে অজ্ঞান্ হইয়া পড়িল। পীর ছাহেব ইহাতে কিছুমাত্র দমিলেন না। তিনি বরং সরোষে বলিলেন, এমন লোককে মারিতে তোমাদের ভয় করিতেছে কি? জোরে প্রহার কর।" অতঃপর প্রহার চলিতে লাগিল; পীর ছাহেব প্রতিবার "জোরে জোরে" বলিয়া প্রহারকারীকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। ইহাতে মায়ের মন স্বভাবতঃই নরম হইল এবং উহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পীর ছাহেবের নিকট অনুরোধ জানাইলেন। পীর ছাহেব বলিলেন, তাঁহার মা ক্ষমা না করা পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়া হইবে না।

অতঃপর তাহার মাতা তাহাকে ক্ষমা করিলে পীর ছাহেব উহাকে অব্যাহতি দিলেন।

পীর ছাহেবের হেদায়াতের প্রথম জীবনের তেজ বিক্রম ও বিচার আচার সম্পর্কিত বহু ঘটনা রহিয়াছে। এমন কি স্থানীয় মহাকুমা হাকীম পর্য্যন্ত বহু মোকদ্দমা মীমাংসার জন্য পীর ছাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। সেই সকল ঘটনা উল্লেখ করিলে গ্রন্থের কলেবর বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে আশংকা করিয়া আমরা উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। পরিণত বয়সে পীর ছাহেবের হেদায়াত ও তাবলীগের ধারায় যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল ও বিভিন্ন কার্য্যের প্রসারতা ঘটিয়াছিল উহা আমরা অত্র জীবনী পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে বিস্তারিত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বাড়ীতে

পীর ছাহেব ছফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরাম আয়েস করিতেন না। বাড়ীতেও তাঁহার নিয়মিত কর্ম্ম-সূচী ছিল। তদীয় পীর কেবলা তাঁহাকে কেতাব অধ্যয়ন করার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। সেই হইতে তিনি ফেকাহ, হাদীছ, তফছির ও বিভিন্ন দিনী কেতাবাদি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই সকল কেতাব অধ্যয়ন করিতে যত্নবান হন। তখনকার পীর ছাহেবের বাড়ী-ঘরের অবস্থা জীর্ণ-শীর্ণ ছিল। বাড়ীটি যথেষ্ট

বড় হইলেও চতুর্দ্দিকে খানা ডোবা ও এঁদোপুকুর ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। চলা-ফেরার সুব্যবস্থা ছিল না। জঙ্গলে চারিধার পরিপূর্ণ ছিল। ইহারই এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী। বাড়ীর ভিতরে গোলপাতা ও নারিকেল পাতার কয়েকখানি ঘর। বাহির বাড়ীতে একখানি মাত্র দোচালা কাচারী। ইহাই ছিল পীর ছাহেবের বহির্বাটির ঘর। এখানেই তিনি বসিতেন। সুপারীর চালিযুক্ত চৌকি ও মোটা-পাতার হোগ্‌লা তখন একমাত্র বসিবার বিছানা ছিল। এই আয়োজনের মধ্যে কাপড়ের গাঁঠুরিতে তাঁহার অধ্যয়নের কেতাব সমূহ রক্ষিত হইত। কেতাব রাখিবার একটি আলমারী পর্য্যন্ত ছিল না। সেই গাঁঠুরি খুলিয়া তিনি কেতাব বাহির করিয়া অধ্যয়ন করিতেন; আবার এই গাঁঠুরিতে বাঁধিয়া রাখিয়া দিতেন। এই সময় বেশ কিছু লোক মুরিদ হইয়াছে। তাঁহারা প্রায়ই দরবারে আসা-যাওয়া করিতেন। তাহাদিগকে তালীম-তওয়াজ্জোহ দিতেন এবং নিজে মোরাকাবা করিতেন। আবার অবসর সময়ে কেতাব খুলিয়া বসিতেন। ২।১ জন করিয়া আলেমও এই সময় সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহারা তরিকা শিক্ষা করিতেন এবং কেতাবাদি হইলে মছলা তাহ্‌কীক করিতেন। তরীকা শিক্ষার্থী মুরিদগণ সেই সময় প্রায়ই আসা যাওয়া করিতেন। পীর ছাহেব তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতেন। অতি সাধাসিদা ধরণের খানার আয়োজন হইত। তিনি নিজেও এই মেহমানদের সঙ্গে বসিয়া খাইতেন। ইহাতে বাড়াবাড়ি বা লৌকিকতা ছিল না। মোটা বিছানায়

মাটির বাসনে মামুলী খানা খাইয়া তিনি নিজ সাধনায় লিপ্ত হইতেন, কেতাব অধ্যয়ন করিতেন, শরীয়তের মছলা তাহকীক করিতেন, ফতোয়া সঙ্কলন করিতেন, আগন্তুকদিগকে তালিম তওয়াজ্জোহ দিতেন এবং বৈঠকি ওয়াজ নছিহত করিতেন। তিনি নিয়মিত ফজর ও মাগরেবের বাদ দীর্ঘ সময়ে মোরাকাবা করিতেন। জীর্ণ গৃহে মোটা পাতার বিছানায় ২।৪টি সঙ্গী পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার জীবনের বিরাট ভবিষ্যৎ এই ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল।

আর্থিক স্বচ্ছলতার কোনও লক্ষণই ছিল না। কিন্তু দীনের চর্চ্চা ও দীপ্ত ইমানের জ্যোতি সেই জীর্ণ আস্তানাকে সর্ব্বদা সজীব করিয়া রাখিত। পীর ছাহেবের ভিতরে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জ্জনের কোনও চেষ্টাই দেখা যাইত না। তিনি একবার মুছলিম ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার হইবার বাসনা পোষণ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি এই বাসনাটি নিজ পীরের গোচরিভূত করিয়া ছিলেন। তদীয় পীরে কামেল শুধু এই টুকুই উক্তি করিয়াছিলেন যে "চাকুরী অপেক্ষা হেদায়েৎ উত্তম কাজ।" তিনি মোরশেদের এতটুকু উক্তিতে চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর মোরশেদে কামেলের অনুপ্রেরণায় তিনি নিজকে আল্লাহ্‌র পথে ধীরে ধীরে বিলীন করিয়া দিবার সাধনায় ডুবিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং তদীয় জীর্ণ কুটিতে বসিয়া মোরাকাবা, মোসাহেদা, তালীম-তওয়াজ্জোহ, ওয়াজ-নছিহত ও কেতাব অধ্যয়নে রত থাকিতেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহ

পীর ছাহেব প্রথমা স্ত্রী, পুত্র এবং জননীকে লইয়া মক্কাশরীফে গিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেখানে স্ত্রী এবং পুত্র এন্তেকাল করেন। পরে জননীকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। ফরিদপুর জিলার কুশলা গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মরহুম চৌধুরী আবদুল ওয়াফী ছাহেবের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয় ঘটে। মরহুম চৌধুরী আবদুল ওয়াফী ছাহেব দীনদার ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পীর ছাহেবের ন্যায় একজন যোগ্য আলেম ও অলি আল্লাহ জামাতা লাভ করিয়া নিজকে বিশেষ কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। তিনি তদীয় কন্যার সহিত জামাতার বাড়ীতে একটি দাসী দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পীর ছাহেব শরীয়তের খাতিরেই দাসী অস্বীকার করিয়াছিলেন। কন্যাপক্ষ এই নিয়া একটু বেশী পীড়াপীড়ি করিলে পীর ছাহেব জওয়াব দিয়াছিলেন যে, "যদি আপনারা একান্তই কন্যার সহিত বাঁদী দেন তবে আমি তাহাকে পৃথকভাবে রাখিতে পারিব না। গায়র মোহার্‌রমা নারী আমার সংসারে কিরূপে থাকিবে? সুতরাং শরীয়তের খাতিরেই তাহাকে আমার নেকাহ করিতে হইবে এবং আমার স্ত্রী হইলে আমি তাহাকে আপনাদের কন্যার সম-মর্য্যাদা দান করিব। তাহার গহনা ও কাপড় চোপড় সবই আপনার কন্যার ন্যায়ই হইবে।" পীর ছাহেবের এই উক্তিতে কন্যা পক্ষ দমিয়া

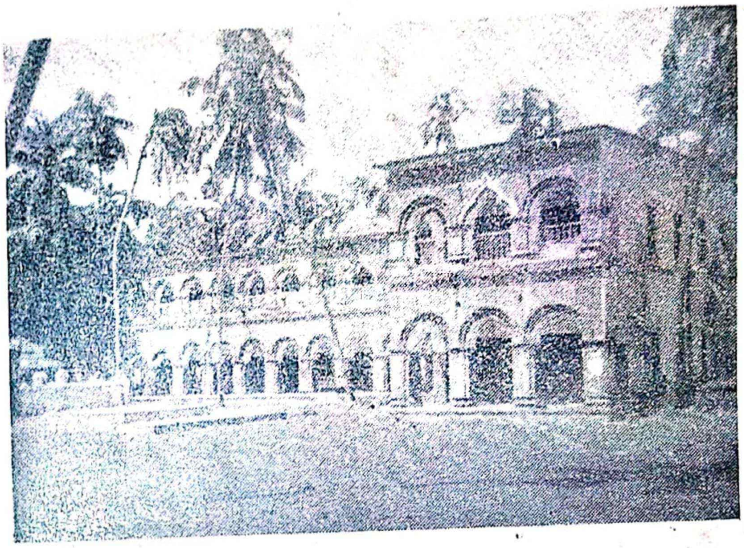
গেলেন এবং কন্যার সহিত দাসী দিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

পরবর্ত্তীকালে পীর ছাহেব কেবলা আরও একটি বিবাহ করিয়াছিলেন। সংসারে মেহমান সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় পীর ছাহেবকে এই বিবাহ করিতে হইয়াছিল। এই উভয় পুণ্যশীলা গৃহিণীই পীর ছাহেবের জীবনের আদর্শ ও শিক্ষা বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ধৈর্য্য, অতিথি সেবা, এবাদত বন্দেগী, তাকওয়া পরহেজগারী ও পরদাপুশিদার দিক দিয়া উভয় মহিলাই আদর্শ স্থানীয়া এবং স্থানীয় নারী সমাজের পরম শ্রদ্ধার পাত্রীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা উভয়েই তরীকার বহু উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছেন। তছবীহ তাহলীল, জেকের মোরাকাবা ও নফল এবাদতে উভয়ই বিশেষরূপে অভ্যস্ত। পীর ছাহেবের এই উভয় স্ত্রী হইতেই সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করিয়াছে। তাঁহারা উভয়েই আল্লাহর রহমতে পীর ছাহেবের পরিত্যক্ত সন্তানসন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও অগণিত মুরীদ মোতাকেদের পরম শ্রদ্ধাভাজন হিসাবে জীবিতা আছেন। আল্লাহতায়ালা তাহাদের দীর্ঘদিনের হায়াত দান করুন।

মক্তব প্রতিষ্ঠা

পীর ছাহেব যখন হুগলী মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করিতেন তখন সমপাঠিগণের সংগে সময় সময় নানা বিষয় লইয়া তর্ক হইত। পীর ছাহেবের সংগে তর্কে তাহারা প্রায়ই হারিয়া যাইতেন। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা আর কোন উপায়ে পীর ছাহেবকে জব্দ করিতে না পারিয়া তাহারা তাঁহাকে বরিশালের 'ডাকু' বলিয়া আখ্যা দিতেন। "বরিশালের ডাকু" কথাটি একেবারে উড়াইয়া দিবার কথাও ছিল না। বরিশালের ডাকাতগণের খ্যাতি বেশ কিছু দূরান্তরেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হুগলী মাদ্রাছার ছাত্ররাও বরিশালের এই সুনামটি (?) সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। কাজেই পীর ছাহেবের সংগে তর্কে পরাজিত হইয়া সমপাঠিগণ ডাকাতের বিশেষণটি চড়াইয়া দিয়া পরাজয়ের চূড়ান্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন। পীর ছাহেব তর্কের বেলায় তখনকার মত এই কথাটী হজম করিয়া লইতেন বটে, কিন্তু তিনি দেশবাসীর উপর এমন একটি ঘৃণ্য অপবাদ বিদেশী কর্ত্তৃক নিজ কানে শ্রুত হইয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইতেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি কথা প্রসংগে আমাদের নিকটে বহুবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি সেই হইতে দেশবাসীর এই বদনাম ঘুচাইবার বাসনা মনে পোষণ করিতেন।

ইহার পরে তিনি হেদায়েত তাবলীগে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, দেশে শিক্ষারই প্রকৃত অভাব। চোর ডাকাত,



মরহুম পীর ছাহেব প্রতিষ্ঠিত শর্ষিনা দারুছছুন্নৎ আলীয়া মাদ্রাছাহ

খুনী ইত্যাদি সকল বদনামের মূলে রহিয়াছে অশিক্ষা। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি নিজ বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথম একটি কেরাত শিক্ষার মক্তব স্থাপন করেন। কয়েকটি ছাত্র নিয়া সামান্য একখানা গোল পাতার ঘরে এই মক্তবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামান্য বেতনে একজন 'কারী' ছাহেব দ্বারা কোরআন শরীফ তালীম দিতে আরম্ভ করেন। পীর ছাহেব নিজেই বলিয়াছেন যে, "আমি যখন এই মক্তব প্রতিষ্ঠা করি তখন আমার কোনও পুত্র-সন্তান জীবিত ছিল না।"

তিনি নিয়ত করিয়াছিলেন যে, অপরের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিলে কেয়ামতে উহাদ্বারা নিজ সন্তানের কাজ হইবে। ইহা অনুমান ইংরেজী ১৯১৩ কি ১৪ সালের কথা। বিশেষ যত্নের সহিত পীর ছাহেব এই মক্তব পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইহার পর সম্ভবতঃ ১৯১৫ সনে ভাণ্ডারিয়া নিবাসী মোহাম্মদ এমদাদ আলী ছাহেব পীর ছাহেবের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সাক্ষাতে আসেন। তিনি পীর ছাহেবের নিকট মুরিদ হইয়া আল্লাহতালার রাস্তায় অগ্রসর হইবেন এই নিয়ত করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি কিছু ইংরেজী শিখিয়া পরে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া অন্যত্র-মক্তবে কাজ করিতেছিলেন।

তরুণ, তেজস্বী, সরল প্রাণ ও সাহসী এই পণ্ডিতটিকে পীর ছাহেব প্রথম দর্শনেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পীর ছাহেবের বাড়ীতে মক্তবে কাজ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পণ্ডিত ছাহেব সে সময় শর্ষিণা হইতে শতাধিক মাইল দক্ষিণে

এক মক্তবে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করিতেন। পীর ছাহেবের সহিত সাক্ষাতের পর পুনঃ তিনি সেখানে চলিয়া যান। উক্ত পণ্ডিত ছাহেব উক্তি করিয়াছেন যে, "আমি শতাধিক মাইল দূরে থাকিয়া পীর ছাহেবের স্পষ্ট আমন্ত্রণ নিজ কানে শুনিতে পাই এবং স্বপ্নযোগে দেখিতে পাই যে, আমি এক বাদশার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছি।" তিনি বলেন যে, এই ঘটনার পর হইতে শর্ষিণা আসিবার জন্য তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। অতঃপর তিনি সেখানকার মক্তবে ইস্তফা দিয়া শর্ষিণা চলিয়া আসেন। শর্ষিণায় তিনিই বলিতে গেলে রীতিমতো মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিদর্শক আনাইয়া সাহায্য মঞ্জুর করান। অতঃপর সুদীর্ঘ পয়ত্রিশ বছরের ও অধিক কাল যাবৎ এই পরমোৎসাহী বিচক্ষণ ও কর্ম্মঠ পুরুষটিকে পীর ছাহেবের জীবন-সহচর, পরামর্শ দাতা ও কর্ম্ম-পরিচালক হিসাবে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাই।

পীর ছাহেবের বাসনাকে রূপ দিবার কাজে তাঁহার উদ্যমের অভাব কোনও দিনই পরিলক্ষিত হয় নাই। বাগ্মীতায়, বিচক্ষণতায়, সাহসে, ত্যাগে ও নানাবিধ কুশলতায় এই সুশিক্ষিত পণ্ডিত ছাহেব পীর ছাহেবের জীবন ও কর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত রহিয়াছেন। পরিশিষ্টে বিশেষ করিয়া তাঁহার এবং পীর ছাহেবের অন্যান্য সহচরগণের মোটামোটি জীবনী আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

যাহা হউক, এই মক্তব হইতে মাদ্রাছার উৎপত্তি হইল। পণ্ডিত এমদাদ আলী ছাহেব মাদ্রাছার ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত

হইলেন। গোলপাতার গৃহেই প্রথম এই মাদ্রাছাহ্ শুরু হইয়াছিল। পণ্ডিত ছাহেব কেবল একজন শিক্ষক হিসাবেই নহে বরং পীর ছাহেবের একজন বিশ্বস্ত সহচর হিসাবে এই মাদ্রাছার ক্রমোন্নতির জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রথম হইতেই পীর ছাহেব কেবলা এই মাদ্রাছার ছাত্রবৃন্দকে আদর্শ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোযোগ দেন এবং ছাত্রগণের পড়াশুনা, আদব-কায়দা ও লেবাছ-পোষাক ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে ইছলামী নীতি অনুযায়ী গঠন করিতে যত্নবান হন। কিছু সংখ্যক ছাত্র বোর্ডিংয়ে রাখার আবশ্যক হওয়ায় বোর্ডিংগৃহ তৈয়ার হইল। গরীব ও মেধাবী ছাত্রগণের উৎসাহ বৃদ্ধি ও সাহায্য দানের জন্য মরহুম হজরত ছুফী ফতেহ আলী ছাহেবের স্মৃতিসূচক ফাতেহিয়া ফাণ্ড নামে একটি সাহায্য ফাণ্ড খোলা হইল। গ্রামে গ্রামে মুষ্টি চাঁদার ব্যবস্থা করিয়া উহাদ্বারা এই ফাণ্ডের তহবীল গঠিত হইত। ছাত্রগণকে এই তহবীল হইতে মাসিক ও এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইত। ভাল ছাত্র গরীব হইলে তাহাকে মাদ্রাছাহ্ হইতে ফ্রি কিংবা হাফ্ ফ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতে লাগিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পীর ছাহেবের খ্যাতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মুরীদের সংখ্যাও তখন প্রচুর হইয়াছিল। এই মুরীদগণ পীর ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত দীনী এলেমের মাদ্রাছার নানাভাবে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দীনি এলেমের সাহায্য করা বিশেষ নেকের কাজ ইহাও জনসাধারণকে সভা

সমিতিতে কোরআন হাদিছের নির্দ্দেশ অবলম্বনে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেব এবং পীর ছাহেবের মুরীদ মরহুম মৌলভী কাজী মোবারক আলী ছাহেব প্রমুখ জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে মাদ্রাছার প্রচার কার্য্যে বাহির হইতেন এবং প্রচুর চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। এই ভাবে একমাত্র জনসাধারণের সাহায্যের উপরই ক্রমান্বয়ে মাদ্রাছাটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাদ্রাছায় উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগে কোনই ত্রুটী করা হইত না। শিক্ষকগণ দীনী এলেম শিক্ষা দিতে যাইয়া নাম মাত্র বেতন গ্রহণ করতঃ সন্তুষ্ট থাকিতেন। পীর ছাহেব ছাত্র ও শিক্ষকগণকে আন্তরিক যত্ন ও গভীর মমতায় আবদ্ধ করিতেন। আল্লাহ্‌র কাজে পীর ছাহেবের অসীম আগ্রহ দেখিয়া সকলেই যে কোন অসুবিধা হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতেন।

প্রতি বৎসর নূতন একটি করিয়া জমাত খোলা হইতে লাগিল। অতঃপর ১৩৩০ সনে মাদ্রাছাহ্ জমাতে ছুয়মের পরীক্ষার মঞ্জুরী লাভ করিল। ছাত্রগণ মাদ্রাছাহ্ হইতে আলেম পরীক্ষার সরকারী ছনদ লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। এলেম অনুযায়ী আমলের সংযোগ সাধনের ফলে দেশবাসী এই মাদ্রাছার কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এমদাদ আলী ছাহেবের বাগ্মীতা, প্রচারনৈপুণ্য ও নানাবিধ কর্ম্ম কুশলতার গুণে এই মাদ্রাছাহ্ সহজেই সমাজে ব্যাপক ভাবে প্রশংসা লাভ করিতে থাকে। উহাকে আরও জনপ্রিয় করিয়া

তুলিবার জন্য এমদাদ আলী ছাহেবের প্রচেষ্টায় তদানিন্তন মুছলিম নেতা মওলবী এ, কে, ফজলুল হক এম-এ, বি-এল ছাহেব এই মাদ্রাছার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি পদে বরিত হন। এতদ্ব্যতীত মাদ্রাছার ক্রমোন্নতি, পরীক্ষা ও সাহায্য ইত্যাদি লাভ করার ব্যাপারে এমদাদ আলী ছাহেব পীর ছাহেবের একান্ত বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী হিসাবে প্রভূত পরিশ্রম করিতে থাকেন। ফলে কয়েক বৎসরেই এই মাদ্রাছাহ্ জমাতে উলা পর্য্যন্ত উন্নীত হইল। মাদ্রাছার গৃহের জন্য দালান নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইল। মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেবই প্রথমে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রথমে ইহা অনেকের নিকটেই একটি দুঃসাহসিক প্রস্তাব বলিয়া মনে হইয়াছিল। পীর ছাহেবও প্রথমে মৌখিকভাবে এই প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেব উত্তর দিয়াছিলেন যে, "পীর মরহুম খানজাহান আলীর বিখ্যাত যাট গম্বুজ মছজিদ নির্ম্মাণে পাথর ভাসিয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। আপনি আল্লাহ্‌র একজন প্রকৃত অলী। আমার এতটুকু এতেকাদ আছে যে, আপনার মাদ্রাছাহ্ নির্ম্মাণে লোহা ভাসিয়া আসিবে।" পীর ছাহেব বলিলেন "এরূপ বলিও না, লোকে পাগল বলিবে।" মাষ্টার ছাহেব তাহার অদম্য সাহসে এবং সন্তান সুলভ দাবীতে বলিয়া উঠিলেন "হুজুর, আমি ইহা সর্ব্বত্র ঢোল শোহরত করিয়া প্রকাশ করিব। পীর ছাহেব ঈষৎ হাসিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

অবশ্য পীর ছাহেবের হৃদয়ে এরূপ একটি প্রস্তাবের নকশা যে ছিল না তাহা নহে, বরং এই প্রস্তাব তাঁহারই অন্তরের প্রতিধ্বনি ছিল। তিনি বাহ্যতঃ অসম্মতি দ্বারা কর্ম্মীদের বিশ্বাস এবং দৃঢ়তাই পরীক্ষা করিতেছিলেন। যাহা হউক, মাদ্রাছার দালান নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। উক্ত সনে মাদ্রাছার বার্ষিক ইছালে ছওয়াবের মাহফিলে এই মাদ্রাছাহ দালান নির্ম্মাণের প্রস্তাব উত্থিত হইলে অনেকগুলি ভীম, বর্গা দান স্বরূপ পাওয়া গেল। এইরূপেই পীর ছাহেবের দরবারে মাদ্রাছাহ নির্ম্মাণের লোহা চতুর্দ্দিক হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বিপুল উৎসাহের ভিতরে আশী হাত দৈর্ঘ্য ও বিশ হাত প্রস্থ এক বিরাট দ্বিতল অট্টালিকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। এই দালান স্থাপন করিবার জন্য স্থান নির্ব্বাচন করা হইল। পীর ছাহেবের বাড়ীতে ঘন নারিকেল সুপারি বৃক্ষ সম্বলিত বাগানের মধ্যে ফাঁকা স্থান ছিল না। কাজেই পীর ছাহেবের প্রচুর আয়ের একটি বড় বাগান সমূলে উৎপাটন করিয়া এই প্রাসাদতুল্য দালানের স্থান করা হইল। এই আয়োজনে অনেকে প্রতিবাদ করিল, অনেকে বিস্ময় মনে করিল, কেহ কেহ আবার এই আয়োজনে বিপুল উৎসাহ অনুভব করিতে লাগিল। মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেবের প্রস্তাব ও উপস্থিত সকলের সমর্থনে পীর ছাহেবের দশম কি একাদশ বর্ষ বয়স্ক বড় ছাহেবজাদা মাওলানা শাহ আবুজাফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেবের হস্তে এই মাদ্রাছার ভিত্তি মাপ ঠিক করা হয়।

ফুরফুরার মরহুম মোজাদ্দেদে জমান হজরত মওলানা শাহ মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দীকী ছাহেবের মোবারক হস্ত স্পর্ষিত একখানা ইট এই এমারতের ভিত্তি প্রস্তর রূপে স্থাপন করা হয়। অতি অল্পদিনের ভিতরে এই বিশাল দ্বিতল এমারত নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইলে শর্ষিনার গুবাক কুঞ্জে ইহা একটি অবিস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে দণ্ডায়মান হইল। পাখী-ডাকা নিভৃত নিস্তব্ধ পল্লীর অভ্যন্তরে, এঁদো ডোবা পুস্করিনী পরিপূর্ণ শ্যামল লতাগুল্মে আচ্ছাদিত বনতলে বিরাট সুরম্য প্রাসাদ জাগিয়া উঠিলে দেশবাসী পরম বিস্ময়ের সংগে এই মহান সাধনাকে মোবারকবাদ দিল। দীন ফকিরের কুঁড়ে আস্তানার পার্শ্বে ইছলামের এই সমুন্নত সৌধ শতাব্দীর বুকে ইছলামের একটি নবজাগরণের ইতিহাস সৃষ্টি করিল। এই বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মানে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইল। তদানিন্তন সরকার পীর ছাহেবের খেদমতের সংগী হইলেন। শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ এই অট্টালিকা নির্ম্মাণে এককালীন দশ সহস্র টাকা দান করিলেন। আল্লাহর সাহায্যের উপর পীর ছাহেবের অসীম বিশ্বাস, মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম, উদ্যম ও অধ্যবসায় এবং পীর ছাহেবের বহু ভক্ত মুরীদ, মোতাকেদ, দানশীল প্রতিবেশী, দেশী ও বিদেশীগণের আন্তরিক সহযোগীতায় শর্ষিনার গোলপাতা নির্ম্মিত সামান্য মক্তব এতদিনে একটি বিখ্যাত আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

কেবল মাদ্রাছার অট্টালিকাই নহে, এই সময়ের মধ্যে

বোর্ডিং দালান নির্ম্মাণ

ফ্রি বোর্ডিং এ ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা গুরুতর হইয়া দেখা দিল। কয়েকখানা বৃহৎ গৃহেও ছাত্রদের স্থান-সঙ্কুলান হইতেছিল না। ইহা ব্যতীত তখনকার মতো প্রায় দুইশত ছাত্রের খাওয়ার ঘরের প্রয়োজনও ছিল। এই সমস্যা মাদ্রাছার কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে একটি বিরাট সমস্যা-রূপে দেখা দেয়। কাজেই ইহার সমাধানের জন্য চেস্টা চলিতে লাগিল। স্থায়ী পাকা ছাত্রাবাসই যে ইহার এক মাত্র সমাধান ইহাতে কাহারও দ্বিমত রহিলনা। স্থানীয় জিলা বোর্ডের চেয়ার ম্যান, খানবাহাদুর মওলবী আবদুল ওহাব খান এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিওলিন প্রমুখ পরিদর্শক বৃন্দ একটি পাকা ছাত্রাবাসের আবশ্যকতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন এবং সরকারকে সাহায্য করার জন্য সুপারিশ করেন। ফলে স্থায়ী পাকা এমারৎ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মাদ্রাছার দালান অপেক্ষা এই দালানের পরিকল্পনা ও ব্যয়-বরাদ্দ অনেক বেশী ধার্য্য হইল। এত বড় বিরাট কাজের সাহস ও আছবাব আল্লাহই সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এই বোর্ডিং স্থাপনের স্থান সংগ্রহ করিতে যাইয়া পীর ছাহেবের বসত বাটীর অবশিস্ট ফলবান বৃক্ষসম্বলিত বাগানের এক বিরাট অংশ নস্ট করিতে হয়। বোর্ডিং স্থাপনের স্থানও ইহার প্রাংগন ভূমি সহ উহার ফলবান বৃক্ষরাজির মূল্য হিসাব করিলে সহস্রাধিক টাকা হইবে। পীর ছাহেব ইচ্ছা করিলে মাদ্রাছাহ তহবীল হইতে

বোর্ডিং দালান নির্ম্মাণ

ফ্রি বোর্ডিং এ ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা গুরুতর হইয়া দেখা দিল। কয়েকখানা বৃহৎ গৃহেও ছাত্রদের স্থান-সঙ্কুলান হইতেছিল না। ইহা ব্যতীত তখনকার মতো প্রায় দুইশত ছাত্রের খাওয়ার ঘরের প্রয়োজনও ছিল। এই সমস্যা মাদ্রাছার কর্তৃপক্ষের সম্মুখে একটি বিরাট সমস্যা-রূপে দেখা দেয়। কাজেই ইহার সমাধানের জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। স্থায়ী পাকা ছাত্রাবাসই যে ইহার এক মাত্র সমাধান ইহাতে কাহারও দ্বিমত রহিলনা। স্থানীয় জিলা বোর্ডের চেয়ার ম্যান, খানবাহাদুর মওলবী আবদুল ওহাব খান এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিওলিন প্রমুখ পরিদর্শক বৃন্দ একটি পাকা ছাত্রাবাসের আবশ্যকতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন এবং সরকারকে সাহায্য করার জন্য সুপারিশ করেন। ফলে স্থায়ী পাকা এমারৎ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মাদ্রাছার দালান অপেক্ষা এই দালানের পরিকল্পনা ও ব্যয়-বরাদ্দ অনেক বেশী ধার্য্য হইল। এত বড় বিরাট কাজের সাহস ও আছবাব আল্লাহই সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এই বোর্ডিং স্থাপনের স্থান সংগ্রহ করিতে যাইয়া পীর ছাহেবের বসত বাটীর অবশিষ্ট ফলবান বৃক্ষসম্বলিত বাগানের এক বিরাট অংশ নষ্ট করিতে হয়। বোর্ডিং স্থাপনের স্থানও ইহার প্রাংগন ভূমি সহ উহার ফলবান বৃক্ষরাজির মূল্য হিসাব করিলে সহস্রাধিক টাকা হইবে। পীর ছাহেব ইচ্ছা করিলে মাদ্রাছাহ তহবীল হইতে



সম্মুখ ভাগ হইতে ফ্রি-বোর্ডিং এর দৃশ্য

এই অর্থ সংগতভাবেই গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু উহা তো দূরের কথা, বরং তিনি মাদ্রাছাহ বোর্ডিং ও তৎসংশ্লিষ্ট গৃহাদি নির্ম্মাণের স্থান সমূহের জন্য নিজস্ব বিরাট বসতবাটীর তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ স্থান ওয়াক্‌ফ করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, এই বিরাট ছাত্রবাসের বুনিয়াদ স্থাপন করা হইল। ছাত্রদের উপযোগী স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে এমারত নির্ম্মাণের জন্য শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক ইহার পরিকল্পনা ও ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করান হইল। প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রের বাসোপযোগী দ্বিতল এমারত নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাতাত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে এই এমারত নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইবে বলিয়া সরকারী বরাদ্দ স্থিরিকৃত হইল। আল্লাহর নামে খালেছ নিয়তে কোন কাজ আরম্ভ করিলে আল্লাই উহার সহায় হইয়া থাকেন। পীর ছাহেবের এরূপ সঞ্চিত অর্থ ছিল না কিম্বা তাঁহার কোন জায়দাদও ছিল না যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এতবড় ব্যয় সাপেক্ষ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। তাঁহার লিল্লাহিয়াত, এখলাছ ও তাওয়াক্কোল পূর্ণ মাত্রায় ছিল। এই জন্যই তিনি এতবড় বিরাট কাজে হাত-দিয়াও পশ্চাদপদ হন নাই। এই কাজে অজস্র ধারে অলক্ষ্যে আল্লাহর রহমত নামিয়া আসিতে লাগিল। পীর ছাহেবের দানশীল প্রতিবেশীগণ, দেশবিদেশের দীনদার মুছলমানগণ ও বিশেষ করিয়া তাঁহার মুরীদ ও মোতাকেদগণ এই নেকের কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেব এই প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য্য প্রয়োজনিয়তা ও দাবী লইয়া

মওলবী তমিজুদ্দীন খান ছাহেবের অভিমত

মন্ত্রী শিক্ষা বিভাগ
বাংলা সরকার কলিকাতা

৫ই অক্টোবর — ১৯৪৪।

"দীর্ঘদিন ধরিয়া আমি শর্ষিনা দারুছ্ছুন্নৎ আলীয়া মাদ্রাছাহ্, পরিদর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। অদ্য আমি এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিতে পারায় আমার সেই বাসনা পূর্ণ হইল। পরিদর্শনের সময় আমার সঙ্গে ছিলেন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী খান ছাহেব মফিজুদ্দীন আহমদ এম, এল, এ, ও মুছলিম শিক্ষা-বিভাগের এসিঃ ডাইরেক্টর খান বাহাদুর বদিউর রহমান এবং যুদ্ধোত্তর মাদ্রাছাহ্ সংস্কার-কমিটির সেক্রেটারী খান ছাহেব মুজাফ্ফর উদ্দীন আহ্মদ ছাহেব।"

ইহা একটি অপ্রতিদ্বন্দী মাদ্রাছাহ্ এবং মফঃস্বল বাংলায় ইহা এই শ্রেণীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ মাদ্রাছাহ্। পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব এই মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহার প্রাণ-স্বরূপ।

এই মাদ্রাছার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা প্রধানতঃ আবাসিক শ্রেণীর এবং বেশীর ভাগ ছাত্রই মাদ্রাছাহ সন্নিহিত ছাত্রাবাসে অবস্থান করে। সবচেয়ে বিস্ময়ের এবং আনন্দের বিষয় এই যে, ছাত্রাবাসের সকল ছাত্রকেই বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকবৃন্দ সকলেই উচ্চ-যোগ্যতাসম্পন্ন। মাদ্রাছার অট্টালিকা বিরাট এবং

নির্ম্মাণ-রত ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহার বিশালতাও কম হইবে না।

"জমিয়তে তালাবা" নামক ছাত্রদের আলোচনা-সমিতি, স্বাস্থ্য-চর্চ্চা বিভাগ, অসহায়-ছাত্রদের সাহায্য বিভাগ, সু-সজ্জিত সাধারণ পাঠাগার এবং বার্ষিক-সম্মেলন এই মাদ্রাছার চিত্তাকর্ষক দিক। যে জিনিস আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুগ্ধ করিয়াছে, উহা হইতেছে এখানকার ধর্মীয় পরিবেশ। একমাত্র পীর ছাহেবের কল্যাণেই উহা সম্ভব হইয়াছে। মফঃস্বলের ইহাই একমাত্র মাদ্রাছাহ্ যেখানে টাইটেল খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আরও গৌরবের বিষয় এই যে, প্রথম বৎসরেই টাইটেল বিভাগের পরীক্ষার ফল খুব চমৎকার হইয়াছে। পনের জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আটজন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং উহার একজন সমগ্র প্রদেশের মধ্যে গুণানুসারে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

মাদ্রাছার আর একটি বৈশিষ্ট উহার হেফজুল কোরআন বিভাগ। কিছুকাল যাবৎ উহা চলিয়া আসিতেছে এবং উহা বিশেষ সৌষ্ঠবের সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতির যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের অতীত যেমন গৌরবময়, আমি আশা করি ইহার ভবিষ্যৎও তেমনি গৌরবে সমৃদ্ধ হইবে।

(স্বাঃ) টি, খান
মন্ত্রী, বাংলা সরকার।

বাহাদুরপুরের জনাব মাওলানা বাদশা মিয়া ছাহেব ১৩৫৩ সনের ৮ই আশ্বিন শর্ষিণা মাদ্রাছার তশরীফ আনেন এবং মাদ্রাছা সম্পর্কে নিম্ন মন্তব্য করেন ঃ—

"অদ্য আমি শর্ষিণা আমন্ত্রিত হইয়া মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত ছিনিয়ার মাদ্রাছাহ পরিদর্শন করিয়া এবং তৎসঙ্গে তদীয় কুতুবখানা এবং মাদ্রাছার বোর্ডিং দেখিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিলাম। মাদ্রাছাটীর শিক্ষাদান কার্য্যও উপযুক্ত মোদারিছগণ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে চলিতেছে বলিয়া মনে হইল। প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সুবৃহৎ সদানুষ্ঠানটি বঙ্গীয় সমাজের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য বাংলার মুছলমান সমাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে। তাই এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বদা সৌসাদৃশ্য ও শক্তিশালী করার জন্য যথাসাধ্য সাহায্যে তৎপর হওয়া দরকার এবং ইহা শীঘ্রই জন-সাধারণের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

এইরূপ সু-প্রতিষ্ঠান জিলা বোর্ডের পক্ষেও গৌরবের বিষয় ঃ জিলা বোর্ড ইচ্ছা করিলে এবং বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের একটু সুদৃষ্টি হইলে অনায়াসে ইহা যথোপযুক্ত সাহায্য পাইতে পারে। আশা করি, জিলা বোর্ড অচিরে এদিকে সুদৃষ্টি দান করতঃ যথাসাধ্য সাহায্য দানে প্রয়াস পাইবেন।

স্বাঃ আবাখালেদ রশীদুদ্দীন আহমদ,
ওরফে বাদশা মিয়া

অবিভক্ত বাংলার অদ্বিতীয় আলেম মরহুম মাওলানা রুহোল আমীন ছাহেব ১৯৩৩ সনের ৫ই জুলাই এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করেন এবং নিম্ন অভিমত লিপিবদ্ধ করেন।

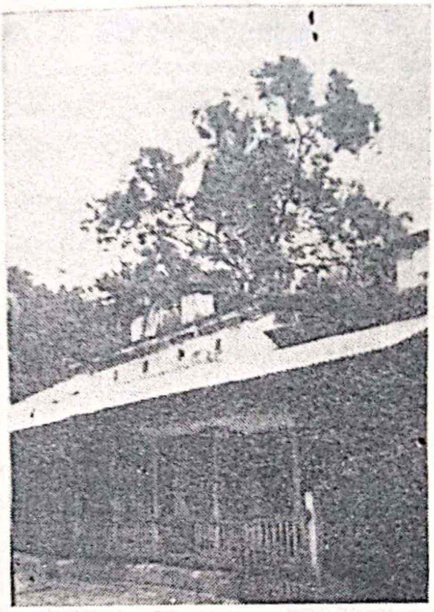
"অদ্য ১৯৩৩ সনের ৫ই জুলাই তারিখে বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত শর্ষিনা দারুচ্ছুন্নৎ ছিনিয়ার মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা একটি গৌরবের জিনিস। এলেমের সহিত আমলের সংযোগ রক্ষার জন্য এখানে বিশেষরূপে বন্দোবস্ত আছে। তদ্রূপ অন্যত্র কুত্রাপী দৃষ্ট হয় না। মুদার্‌রেছ ছাহেবান সকলেই আলেম বা আমল এবং তাঁহাদের যোগ্যতা ও শিক্ষাপদ্ধতি অন্যত্র কচিৎ দৃষ্ট হয়। মাদ্রাছার সেক্রেটারী মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব, মোদার্‌রেছ ছাহেবান সংযোগে ব্যক্তিগত ভাবে মাদ্রাছার তালবে এলেমগণের যেরূপ যত্ন নিয়া থাকেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংনীয়। বোর্ডিংএ থাকার জন্য ছাত্রদের যেরূপ সুবন্দোবস্ত আছে তাহাও অন্যত্র দুর্ল্ভ। গরীব মেধাবী একশত ছাত্রের জন্য বোর্ডিংএ খোরাকীর ও থাকার ফ্রি বন্দোবস্ত আছে। যদি কেহ মাদ্রাছায় লিল্লাহ সাহায্য করিয়া ছদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব হাছেল করিতে চান, আমার মতে ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান। তালবে এলেমদিগের জন্যও এই মাদ্রাছায় পড়াই সমধিক শ্রেয়ঃ।

রুহোল আমীন
বসীর হাট, ২৪, পরগনা

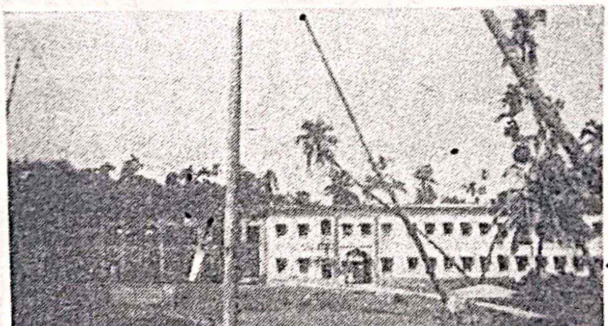
জনাব এ, কে ফজলুল হক ছাহেবের অভিমত :—

অবিভক্ত বাংলার তদানিন্তন প্রধান-মন্ত্রী জনাব এ, কে ফজলুল হক ছাহেব এই মাদ্রাছা পরিদর্শন করেন। তাঁহার আগমনোপক্ষে বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং মাদ্রাছা তাঁহাকে বিভিন্ন ভাষায় মানপত্রাদি দ্বারা বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। তিনি উক্ত সভায় উর্দ্দুতে যে বক্তৃতা প্রদান করেন নিম্নে তাঁহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল।

"মাননীয় হজরত পীর ছাহেব কেবলা এবং সমাগত ভদ্র মণ্ডলি! ইহা একটি ইছলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান! এখানে কোনও ইছলামী ভাষায়ই আমার বক্তব্য প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। এই মাদ্রাছাহ্ এবং পবিত্র অধিবেশনের কি প্রশংসা করিব! ইহার সুখ্যাতি এখন সূর্য্যালোকের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভ্রমনোপলক্ষে আমি নোওয়াখালি চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলাম। সেই সকল স্থানে এবং আরও বহু-স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি এবং সুযশের কথা শুনিয়াছি। ইহা ছাড়া আমারও দৃঢ় বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা আছে যে, এই মাদ্রাছার শিক্ষা-দীক্ষা কার্য্য-করি ভিত্তির প্রতিষ্ঠিত। আমি এই মাদ্রাছার কার্য্যকারী সংসদের সহিত সংশ্লিষ্ট। যদিও আমি ইহার প্রত্যেক সভায় উপস্থিত হইতে পারি না এবং বাহ্যিক ভাবে এই স্থান হইতে দূরে থাকি, কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন যে, আমি আন্তরিক ভাবে সব সময়ই এই মাদ্রাছার সহিত জড়িত রহিয়াছি।



মরহুম পীর ছাহেবের খান্‌কাহ ও কুতুবখানা



সম্মুখ হইতে ফ্রি বোর্ডিং এর এক বাহুর দৃশ্য

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমার কায়রো (মিশরের রাজধানী) যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। সেখানে সাতদিন অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন আমি বিখ্যাত জামে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলাম। সেখানে নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্র সংখ্যা অন্যূন বিশ হাজার হইবে। দেশী ও বিদেশী নানা রাজ্য হইতে এখানে সাহায্য আসিয়া থাকে। উহা একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। উহার তুলনায় এই শর্ষিনা মাদ্রাছাহ্ আমাদের জন্য একটি ক্ষুদ্র 'জামে আজ্হার'। ইছলামী শিক্ষার সহিত দিন দুনিয়ার উভয় শিক্ষাই এখানে দেওয়া হইয়া থাকে। কাজেই এই মাদ্রাছার সাহায্য করা প্রত্যেক মুছললমানের পক্ষে ফরজ। বিশেষ করিয়া বরিশাল বাসীর উপর ইহা অধিকতর ফরজ।"

"মানুষের কর্ত্তব্য নিজের কাজ নিজেই সমাধা করে। পরের উপর নির্ভরশীল হওয়া কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। আপনারা প্রত্যেকে একটি করিয়া পয়সা দিলে বৎসরে বড় রকমের একটা কিছু জমা হইতে পারে। আমিও যথাসাধ্য এই মাদ্রাছার সাহায্য করিব। বর্ত্তমানে এই মাদ্রাছার জন্য সরকার পক্ষ হইতে কিছু টাকার ব্যবস্থা করিয়াছি। উহার পরিমাণ (দশ হাজার টাকা) সরকারী কর্ম্মচারীগণের মারফতে আপনাদের গোচরিভূত হইবে এবং উক্ত টাকা আমার পার্শ্বোপবিষ্ট মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের মারফতে আপনাদের হস্তগত হইবে। উক্ত টাকা দ্বারা আপনাদের অভাব অভিযোগের কোনও কেনারা না হইলে

ভবিষ্যতে এই মাদ্রাছার জন্য স্থায়ীভাবে আর্থিক সাহায্যের চেষ্টা করিব।"

"যদিও আমি সব সময় পীর ছাহেব কেবলার খেদমতে হাজির হইতে পারি না, কিন্তু তাঁহার সহিত সব সময়ই আমার আন্তরিক যোগাযোগ আছে। তিনি আমাদের সকলের জন্য কর্ম্ম প্রেরণার একটি উৎস স্বরূপ। তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে আপনারা যতদূর পারেন এই মাদ্রাছার উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন। তিনি চলিয়া গেলে আপনাদের এই সুযোগ জুটিবে না। তখন বৃথাই অনুতাপ করিবেন। কেননা অধিকাংশ সময়ে 'কদ্‌রে নে'মত বাদ-ই-জওয়াল' হইয়া থাকে।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি পুনঃ একবার এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করেন এবং বিশদভাবে একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ দেশবাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন ঃ—

"আমি ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিয়াছি; সম্প্রতি ১৯৩৮ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিলাম। মাদ্রাছা-কর্ত্তৃপক্ষ এই মাদ্রাছার কার্য্যাবলী আরও বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আর্থিক সাহায্য কল্পে জনসাধারণ সমীপে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক, তজ্জন্য আমি এই মাদ্রাছাহ এবং ইহা শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে খেদমত করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমার মতামত লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

এই মাদ্রাছাহ্ ১৯১৫ সনের ১৫ই জানুয়ারী স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহা উপযুক্ত কার্য্যকরী কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। এই মাদ্রাছাহ্ অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে সমগ্র বাংলা দেশের এই শ্রেণীর মাদ্রাছার মধ্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাদ্রাছায় পরিণত হইয়াছে। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ইহার বহুমুখী কার্য্য পরম্পরার দিক দিয়া এই মাদ্রাছাহ্ ভারতের এই শ্রেণীর যে কোনও মাদ্রাছার সহিত নির্ভয়ে প্রতিযোগীতা করিতে পারে।"

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায়ই এই মাদ্রাছাহ্ও অতিক্ষুদ্র অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া পীর মাওলানা শাহ ছুফী হাজী নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেবের প্রাণান্ত সাধনা এবং তাঁহারই কর্ম্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ একদল আত্মত্যাগী কর্ম্মীর একনিষ্ঠ সাধনার ফলে বর্ত্তমানে এরূপ উন্নত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।"

যে সুরম্য দালানে বর্ত্তমানে এই মাদ্রাছাহ্ অবস্থিত উহা এই মাদ্রাছার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট বটে। এমন কি, মাদ্রাছার কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য পথিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নারিকেল, গুবাক এবং অন্যান্য বহুবিধ ফলবান বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত এই মনোরম অট্টালিকা প্রাণে অবর্ণনীয় ভাবধারা সৃষ্টি করে। অর্থ সঙ্গতিহীন অবস্থায় স্বকীয় ও আত্মনিয়োজিত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠানের এবম্বিধ উন্নতির বিষয় যখনই স্মরণ করি, তখনই পীর ছাহেবের এই সফলতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমরা আরও বিস্ময়ে অভিভূত হই।"

মাদ্রাছাহ সম্পর্কে আমার মতামত অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এই ধরণের মাদ্রাছাহ্ যে কেবল দুর্লভ তাহাই নহে, বরং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকরণযোগ্য একটি মহান আদর্শও বটে। বস্তুতঃ এই প্রতিষ্ঠানের বিরাট সম্ভাবনা দেখিয়া অভিভূত না হইয়া পারা যায় না। পীর ছাহেবের এই মহৎ সেবা যদি দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন, তবে এই মাদ্রাছাহ্ পাক-ভারতের মধ্যে একটি সর্ব্বপ্রধান মাদ্রাছায় পরিণত হইবে ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিরাট প্রতিষ্ঠান পীর ছাহেবের আত্ম-ভোলা কর্ম্ম, অসীম উদ্যম এবং সীমাহীন আগ্রহের একটি বিরাট স্মৃতি-স্তম্ভ।

আমরা আশা করি, এই মহৎ কর্ম্মের আদর্শ আমাদিগকেও কর্ম্মের দিকে প্রেরণা দান করিবে এবং মাদ্রাছার বহুমুখীন কার্য্যাবলী এতদ্দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আরও প্রসারিত হইবে।

এই মাদ্রাছাহ্ সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকে অধিকতর ফলপ্রসূ করিবার জন্য আমি কার্য্যকরী কমিটির পক্ষ হইতে দেশবাসী সকলের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।"

অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী মওলবী হাশেম আলী খান ছাহেবের অভিমত—

স্থানীয় ডিঃ বোর্ডের তদানীন্তন চেয়ারম্যান, অবিভক্ত বাংলার মাননীয় মন্ত্রী মওলবী হাশেম আলি খান পীর ছাহেবের এই মহৎ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মাদ্রাছার উন্নতি-কল্পে প্রভূত সাহায্য করেন। জিলা বোর্ডে তাঁহার চেয়ারম্যান থাকাকালে শর্ষিনা মাদ্রাছার ফ্রি-ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ-কল্পে এককালীন তের হাজার টাকা সাহায্য-স্বরূপ দান করা হয়। জিলা বোর্ডের যে সহৃদয় সদস্যগণ এই ব্যাপারে সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই কৃতিত্বের অংশীদার এবং তাঁহারা সকলেই পীর ছাহেবের এই মহৎ কার্য্যে সমভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। চেয়ারম্যান ছাহেব মাদ্রাছাহ্ প্রাঙ্গণ প্রসারের অপরিহার্য্যতা লক্ষ্য করিয়া তিনি মাদ্রাছাহ্ সন্নিহিত একখণ্ড পতিত জমি একোয়ার করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এই বিষয়ে মাদ্রাছাহ্ কমিটীকে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করেন। তিনি মাদ্রাছাহ্ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন যে, "স্বনামখ্যাত পীর ছাহেব এই মাদ্রাছার প্রাণ-স্বরূপ। এই মাদ্রাছাহ্ তাঁহার আত্ম-ত্যাগের জীবন্ত নিদর্শন।"

মিঃ লিউলিনের অভিমত

বিগত ২৮।৭।৩৮' তারিখে স্থানীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিউলিন এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিয়া বিস্মিত হন এবং নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

"একদিন অপরাহ্নে মুষলধারে বর্ষার ভিতরে আমি এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করি। মাদ্রাছার প্রাঙ্গণ ও আশে-পাশের সব জমি বর্ষার পানিতে ডুবিয়া গিয়াছিল। এই দুর্য্যোগের

ভিতরেও আমি গভীর বনের ভিতরে মাদ্রাছার বিরাট সুদৃশ্য অট্টালিকা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। জানিনা কিভাবে এই বিরাট কার্য্যের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল এবং এই বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইয়াছিল। বাহিরের নামমাত্র সাহায্য লাভ করিয়া একশত ছাত্রকে বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা অপরের পক্ষে নিশ্চিতরূপে গ্রহণযোগ্য একটি আদর্শ বটে।" তিনি মাদ্রাছার গৃহাদি ও মাঠ সম্প্রসারণের নিমিত্ত একখণ্ড জমি একোয়ারের প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং উক্ত কাজের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি পরিশেষে লিপিবদ্ধ করেন যে, আমি এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিলাম। আমি আশা করি, এই প্রতিষ্ঠান অচিরেই জমকালো হইয়া উঠিবে।

খান বাহাদুর মওলবী আবদুল খালেক ছাহেবের অভিমত

বাকরগঞ্জ রেঞ্জের তদানীন্তন স্কুল ইনসপেক্টর খান বাহাদুর মওলবী আবদুল খালেক ছাহেব ১৯৩৯ সনের ১৯শে জানুয়ারী এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিতে যাইয়া একটি সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

"বিগত ১৯শে জানুয়ারী স্বরূপকাঠীর পথে শর্ষিনা ছিনিয়ার মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিয়া আমি আনন্দিত। সুদূর গ্রামের অভ্যন্তরে, বলিতে গেলে এক প্রকার জঙ্গলের মধ্যে এরূপ সুদৃশ্য

অট্টালিকা সমূহ এবং একটি জীবন্ত ও কর্ম-ব্যস্ত আব-হাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া বিস্ময় অনুভব করিতেছি। এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার আবাসিক পদ্ধতি। বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র জন-সাধারণের দানের উপর নির্ভর করিয়া শতাধিক ছাত্রকে দিনের পর দিন আহারের সংস্থান করিয়া দেওয়া সামান্য ব্যাপার নহে!"

ইহা একাধারে যেমন প্রশ্নাতীতরূপে বাংলার এই শ্রেণীর একটি অদ্বিতীয় এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠান তেমনই ইহা কৌতুহলময়। এই প্রতিষ্ঠান কর্ম্ম-নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক এবং এক কথায় ইহা বঙ্গে ইছলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির নব-জাগরণ সূচনা করিয়াছে। মহান পীর ছাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্ব, অক্লান্ত সাধনা ও আত্ম ভোলা শ্রম এবং তাঁহার কতিপয় সহকর্ম্মী ও ভক্তের সেবা এবং বিশেষ করিয়া মওলবী এমদাদ আলী ছাহেব এবং পীর ছাহেবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ একদল কর্মীর দুর্লভ অধ্যবসায়ের নিকট এই প্রতিষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে ঋণী। শর্ষিনা অদূর ভবিষ্যতে ইছলামী বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে যাইতেছে। সুতরাং সংগঠক এবং অধ্যাপকগণকে একটি লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে মৌলিকভাবে চিন্তা করিতে হইবে। আমি আশা করি, অধ্যাপকবৃন্দ সে বিষয় নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন।

একটি সু-প্রশস্ত বোর্ডিং গৃহ অবিলম্বে প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই উহার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য-চর্চ্চার জন্য একটি মুক্ত মাঠেরও প্রয়োজন। এই সম্পর্কেও একটি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। আমি এই সকল বিষয়ে এবং মাদ্রাছার উন্নতিমূলক অন্যান্য ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল সাহায্য আনন্দের সহিত করিব।"

মিঃ কে, সি, রায়ের অভিমত

ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের তদানীন্তন পরিদর্শক বাবু কে, সি, রায় এই মাদ্রাছাহ পরিদর্শন করিয়া নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতে যাইয়া লিখেন যে,—"আমি সোহাগদল এবং সুটিয়াকাঠী স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলাম। সেখান হইতে আমি শর্ষিণা মাদ্রাছাহ পরিদর্শনের জন্য নীত হই। জিলার নিভৃত-কোণে অবস্থিত এই বিরাট প্রতিষ্ঠান দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হই। সম্ভবতঃ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইহা আদর্শ এবং অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার সুরম্য দালান, পুস্তকাগার ও পাবলিশিং কার্য্যালয় প্রভৃতি গড়িতে এখানকার লোকেরা অপরিমিত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।"

"এখানে শিক্ষা ও সংগঠের জন্য যা কিছু করা হইয়াছে সমাজ সেজন্য পীর ছাহেবের নিকট চির ঋণী থাকিবে। আমি তাঁহাকে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।"

(স্বাঃ) কে, সি, রায়।

মওলবী এ, রশীদ ছাহেবের অভিমত

মুছলিম শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন এসিঃ ইনস্‌পেক্টর মওলবী এ, রশীদ ছাহেব এই মাদ্রাছাহ পরিদর্শন করতঃ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে যাইয়া লিখেন ঃ

"আমি এখানে যাহা কিছু দেখিলাম তাহাতে আশাতীত আনন্দ লাভ করিলাম এবং যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক বেশী দেখিলাম। আল্লাহ পীর ছাহেবকে দীর্ঘ জীবন দান করুন যেন তিনি ত্যাগের উচ্চতর স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া যাইতে পারেন।"

মিঃ টাফনেল ব্যারেটের অভিমত

বিগত ১৯৭৫ সনের ২১শে জুলাই স্থানীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন যে, "আমি এই মাদ্রাছাহ্ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। পীর ছাহেবই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি ইহার প্রাণস্বরূপ। মহান পীর ছাহেব এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী মওলবী এমদাদ আলী ছাহেবকে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনের জন্য আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি।"

জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, এস, বানার্জ্জী মহোদয়ের অভিমত

"আমি জনাব মাওলানা ছাহেব এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণকে এই মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

মওলবী তমিজুদ্দীন খান ছাহেবের অভিমত

মন্ত্রী
বাংলা সরকার

শিক্ষা বিভাগ
কলিকাতা
৫ই অক্টোবর — ১৯৪৪।

"দীর্ঘদিন ধরিয়া আমি শর্ষিনা দারুছ্ছুন্নৎ আলীয়া মাদ্রাছাহ্, পরিদর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। অদ্য আমি এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করিতে পারায় আমার সেই বাসনা পূর্ণ হইল। পরিদর্শনের সময় আমার সঙ্গে ছিলেন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী খান ছাহেব মফিজুদ্দীন আহমদ এম, এল, এ, ও মুছলিম শিক্ষা-বিভাগের এসিঃ ডাইরেক্টর খান বাহাদুর বদিউর রহমান এবং যুদ্ধোত্তর মাদ্রাছাহ্ সংস্কার-কমিটির সেক্রেটারী খান ছাহেব মুজাফ্‌ফর উদ্দীন আহ্‌মদ ছাহেব।"

ইহা একটি অপ্রতিদ্বন্দী মাদ্রাছাহ্ এবং মফঃস্বল বাংলায় ইহা এই শ্রেণীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ মাদ্রাছাহ্। পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব এই মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহার প্রাণ-স্বরূপ।

এই মাদ্রাছার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা প্রধানতঃ আবাসিক শ্রেণীর এবং বেশীর ভাগ ছাত্রই মাদ্রাছাহ সন্নিহিত ছাত্রাবাসে অবস্থান করে। সবচেয়ে বিস্ময়ের এবং আনন্দের বিষয় এই যে, ছাত্রাবাসের সকল ছাত্রকেই বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকবৃন্দ সকলেই উচ্চ-যোগ্যতাসম্পন্ন। মাদ্রাছার অট্টালিকা বিরাট এবং

নির্ম্মাণ-রত ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহার বিশালতাও কম হইবে না।

"জমিয়তে তালাবা" নামক ছাত্রদের আলোচনা-সমিতি, স্বাস্থ্য-চর্চ্চা বিভাগ, অসহায়-ছাত্রদের সাহায্য বিভাগ, সু-সজ্জিত সাধারণ পাঠাগার এবং বার্ষিক-সম্মেলন এই মাদ্রাছার চিত্তাকর্ষক দিক। যে জিনিস আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুগ্ধ করিয়াছে, উহা হইতেছে এখানকার ধর্মীয় পরিবেশ। একমাত্র পীর ছাহেবের কল্যাণেই উহা সম্ভব হইয়াছে। মফঃস্বলের ইহাই একমাত্র মাদ্রাছাহ্ যেখানে টাইটেল খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আরও গৌরবের বিষয় এই যে, প্রথম বৎসরেই টাইটেল বিভাগের পরীক্ষার ফল খুব চমৎকার হইয়াছে। পনের জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আটজন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং উহার একজন সমগ্র প্রদেশের মধ্যে গুণানুসারে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

মাদ্রাছার আর একটি বৈশিষ্ট উহার হেফজুল কোরআন বিভাগ। কিছুকাল যাবৎ উহা চলিয়া আসিতেছে এবং উহা বিশেষ সৌষ্ঠবের সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতির যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের অতীত যেমন গৌরবময়, আমি আশা করি ইহার ভবিষ্যৎও তেমনি গৌরবে সমৃদ্ধ হইবে।

(স্বাঃ) টি, খান
মন্ত্রী, বাংলা সরকার।

অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রী মওলবী মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোছাইন ছাহেব ১৯৪৬ সনের নবেম্বর মাসে একবার এই মাদ্রাছাহ্ পরিদর্শন করেন এবং নিম্ন অভিমত ব্যক্ত করেন।

"আমি বিগত নবেম্বর মাসে এই মাদ্রাছাহ পরিদর্শন করি। জিলার অভ্যন্তরে এরূপ একটি আদর্শ মাদ্রাছাহ্ দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হই। মাদ্রাছায় টাইটেল ক্লাস খোলা হইয়াছে। এক টাইটেল বিভাগেই শতাধিক ছাত্র রহিয়াছে। মাদ্রাছার অধিকাংশ ছাত্রই মাদ্রাছাহ্ সন্নিহিত ছাত্রাবাসে অবস্থান করে। অতএব ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে একটি আবাসিক আরবী কলেজ। বঙ্গদেশে ইহাই এই শ্রেণীর একমাত্র প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাছার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট এই যে, শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্রের বাসস্থান এবং খোরাক মাদ্রাছার পক্ষ হইতে বহন করা হয়। বর্ত্তমানে ৩০০ ছাত্র ফ্রি-খোরাক ভোগ করিতেছে। আমি মনে করি, ইহার মাসিক ব্যয় ৬০০০্ হাজার টাকার ন্যূন হইবে না। এই বিরাট ব্যয় ভার মাদ্রাছার সেক্রেটারী মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেবের উপর নির্ভরশীল। মাওলানা ছাহেবের ভক্ত মুরীদগণ ছাত্রদের সম্বৎসরের খোরাক বহন করেন। ইহা একটি অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠান। আমি আশা করি, এই আদর্শে বাংলার অন্যান্য অংশেও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। মাদ্রাছার উপযুক্ত শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা ছাড়াও প্রতিটি ছাত্রকে শরিয়তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালন করা হয়। এই মাদ্রাছাহ্ এবং ছাত্রাবাস নির্ম্মাণে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ছাত্রাবাস আরও বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন খুবই বেশী। আমি এই বিষয় নিশ্চিত যে, সরকার এই প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিবেন। এই মাদ্রাছার যথার্থ পরিচর্য্যা করা হইলে এবং সরকার ইহার উপযুক্ত যত্ন নিলে ইহা ভবিষ্যতে বাংলার **জামে আজহারে** পরিণত হইবে।"

খান ছাহেব এম, এন, হোছাইন ছাহেবের অভিমত

বিভাগীয় স্কুল সমূহের পরিদর্শক খান ছাহেব এম, এন, হোছাইন ছাহেব ২৬।১২।৪৬ সনে এই মাদ্রাছাহ্ একবার পরিদর্শন করতঃ নিম্ন অভিমত লিখিয়া যান।

"আমি শর্ষিনা দারুছ্ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাছাহ্ বিগত ২৬, ১২, ৪৬ তারিখে পরিদর্শন করি। পূর্ব্বে এই মাদ্রাছাহ্ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, কিন্তু একজন মুছলিম ধর্ম্মনেতার অপরিসীম অধ্যবসায়ে এবং প্রাণান্ত সাধনার ফলে জিলার অখ্যাত কোণে হঠাৎ এই বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার কিছুই জানিতাম না।

পীর ছাহেবের বিপুল সংখ্যক অনুসরণকারী রহিয়াছে। তাঁহারা পীর ছাহেবের নির্দ্দেশকে সম্ভবতঃ আইনের ন্যায়ই মান্য করিয়া থাকেন। সুতরাং সরকারের উল্লেখযোগ্য সাহায্য ব্যতীতই তাঁহাদের সহায়তায় এই অল্প সময়ের মধ্যে এখানে প্রাচীন ইছলামী কালচারের স্মৃতি-মিনার গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান প্রাদেশিক গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া জিলা অর্গানাইজার পর্য্যন্ত ছোট বড় বহুলোক কর্তৃক

পরিদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের মারফত যে সাহায্য এই প্রতিষ্ঠানে করা হইয়াছে তাহা শান্তি-নিকেতনে প্রদত্ত সাহায্যের তুলনায় একান্তই নগণ্য। এই আবাসিক প্রতিষ্ঠানের তিনশত শিক্ষার্থী এবং সুদূর চীন দেশের একজন অধ্যাপকসহ বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ সকলেই দৈনিক বিনামূল্যে খাদ্য খাইয়া থাকেন। এই দুর্দ্দিনে ইহা সামান্য বিষয় নহে, এবং একমাত্র এই জন্যই বৎসরে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এখানে লক্ষাধিক টাকার এমারৎ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখনও এতদপেক্ষা অধিক ব্যয়ের পরিকল্পনা সমূহ রহিয়াছে। শিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এই প্রতিষ্ঠানের রহিয়াছে। বিচক্ষণ উপদেষ্টা এবং বিজলী সরবরাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সম্মুখে যে সময় এবং সুযোগ রহিয়াছে, উহার সদ্ব্যবহারের জন্য যদি সরকার অর্থ এবং উপদেষ্টা লইয়া অগ্রসর হন তবে উহা বিশেষ যুক্তিযুক্ত হইবে। এখানে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন একটি মানুষ বিস্ময়কর ক্ষমতা নিয়া বসিয়া আছেন। ইছলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী কোনও পরিকল্পনা লইয়া সরকার অগ্রসর হইলে এই অসাধারণ শক্তিমান মানুষটি সর্ব্বপ্রকার সেবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। বস্তুতঃ পয়গম্বর (দঃ) শ্রম ও সৈনিক জীবনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এখানে কর্ম্মের এক বিরাট ময়দান উন্মুক্ত রহিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষা বিভাগ এ সম্পর্কে উপযুক্তভাবে তৎপর হইবেন।"

শর্ষিনায় টাইটেল মাদ্রাছাহ্

মরহুম পীর ছাহেবের জীবন ব্যাপী সাধনার ফলে শর্ষিনা আলীয়া মাদ্রাছাহ এবং ইছলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক যে সকল প্রতিষ্ঠান শর্ষিনায় গড়িয়া উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে শত শত মূল্যবান ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিমত ও প্রশংসাবাদের কয়েকটি মাত্র পাঠকগণের খেদমতে হাজির করিলাম। স্থানাভাবে এবং পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় আমরা বহু পরিদর্শকের অভিমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। এখানে টাইটেল মাদ্রাছাহ্ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দু'একটি কথা আলোচনা করিতেছি।

এতদিনে শর্ষিনা মাদ্রাছাহ্ একটি সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। মাদ্রাছাটি জমাতে উলা পর্য্যন্ত নিয়মিত গৌরবের সহিত পরিচালিত হইতে লাগিল। মাদ্রাছার দ্বিতল দালান, দ্বিতল বোর্ডিং-গৃহ ইত্যাদিরও নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হইল। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ মানের ইছলামী শিক্ষার জন্য এই মাদ্রাছাহ যথেষ্ট ছিল না। কাজেই মফঃস্বলের গরীব ছাত্রদের উচ্চতম ইছলামী তালীমের অভাব ঘুচিল না। সর্ব্বোচ্চ মানের ইছলামী তালীমের ব্যবস্থা সমগ্র বাংলা দেশে একমাত্র কলিকাতায়ই ছিল। কাজেই "দরজায়ে-ফাজেল" সমাপ্তির পর সর্ব্বোচ্চ স্তরের আরবী শিক্ষার্থীগণকে হয় কলিকাতা নতুবা সুদূর দেওবন্দ, রামপুর কিংবা ছাহারানপুর যাইতে হইত। ইহা একাধারে যেমন ব্যয় বহুল, তেমনই কষ্ট-সাধ্য হওয়ায় বহু উৎসাহী ও মেধাবী ছাত্র এই শিক্ষা

হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। পীর ছাহেব মফঃস্বলের এই সকল বঞ্চিত ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত হইলেন। ফলে শর্ষিনায় উচ্চতম ইছলামী তালিমের জন্য 'টাইটেল' ক্লাস খোলার প্রস্তাব উত্থাপন হইল। কিন্তু সরকারীভাবে মফঃস্বলে টাইটেল বিভাগ খুলিতে আইন-ঘটিত বাধা ছিল। বাংলা দেশে একমাত্র কলিকাতা ব্যতীত 'টাইটেল' কোর্স পড়াইবার আইনতঃ অধিকার ছিল না। কাজেই এই বিষয় বিরাট বাধার সম্মুখীন হইতে হইল। পীর ছাহেব ইহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি অদম্য আগ্রহে এই বাধা অপসারণের জন্য শিক্ষা বিভাগ এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। পীর ছাহেবের পক্ষ হইতে মওলবী এমদাদ আলী ছাহেব ক্রমান্বয়ে দরবার করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত সাত বৎসর চেষ্টা তদ্‌বিরের ফলে অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মওলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের দৃষ্টি এই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলে এই আইন রহিত হইয়া মফঃস্বল বাংলায় টাইটেল পড়াইবার আইন-গত বাধা অপসারিত হয়। অতঃপর ইংরেজী ১৯৪২ সনে টাইটেল বিভাগও খোলা হইল। পীর ছাহেবের এই এরাদা বআল্লাহ এতদিনে পূর্ণ করিলেন। তিনি হজরত রছুলে মকবুল (দঃ) এর হাদীছ শরীফের উচ্চ-মানের শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং যাহারা এই কাজে সাহায্য, সহযোগিতা ও চেষ্টা তদ্‌বির করিয়া এই বাধা অতিক্রমে সহায়তা

করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য দোওয়া করিলেন। পীর ছাহেবের এই প্রচেষ্টার ফলে মফস্বলে টাইটেল পড়াইবার আইনগত বাধার চির অবসান ঘটিল এবং গ্রামদেশের গরীব ও মেধাবী উচ্চ আরবী শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটি পরম সুযোগ লাভ হইল। আজ পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে টাইটেল মাদ্রাছার অস্তিত্ব দেখা যায়, পীর ছাহেব কেবলার ঐকিক প্রচেষ্টাই ছিল ইহার মূল কারণ।

টাইটেল বিভাগ খোলার জন্য সরকার হইতে কেবল অনুমতি মাত্রই পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার আয়োজন ও উদ্বোধন করিতে মাদ্রাছাহ্ কর্ত্তৃপক্ষকে প্রভূত আর্থিক ব্যয় বহন করিতে হয়। টাইটেল বিভাগের জন্য দারুল-হাদীছ নামে স্বতন্ত্র একটি দ্বিতল এমারৎ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এইজন্য মাদ্রাছাহ্ কর্ত্তৃপক্ষকে পয়তাল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। অধিকন্তু এই বিভাগের ছাত্রদের জন্য একটি বিরাট 'কুতুবখানা' গঠন করিতে হয়। কারণ এই বিভাগের পাঠ্যসমূহ অনেক বেশী এবং ইহার মূল্যও অত্যধিক; কাজেই প্রায় ছাত্রের পক্ষে এই বিভাগের পাঠ্য খরিদ্ করিয়া পাঠ করা দুরূহ। সেইজন্য এই বিভাগের ছাত্রদের সাহায্যার্থে মাদ্রাছার পক্ষ হইতে কেতাবের সংস্থান করিতে হয়। এইজন্য ছেহাহ্ ছেত্তাহ্ হাদীছ, উচ্চ-শ্রেণীর তফ্ছীর এবং ইছলামী ইতিহাস ও অন্যান্য কেতাব সমূহের একটি বিরাট কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই লাইব্রেরীতে এযাবৎ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে শতাধিক

ছাত্রের উপযোগী দরছি কেতাব সংগৃহীত হইয়াছে। এই লাইব্রেরী গঠনে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ মাত্র ছয় হাজার টাকা।

অবশিষ্ট অর্থ দানশীল দীনদার মুছলমানগণের নিকট হইতে চাঁদা স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। কেহবা একটি ছাত্রের সম্পূর্ণ কেতাব অথবা উহার মূল্য দান করিয়া এই মহান কাজের সঙ্গী হইয়াছেন। অবশ্য টাইটেল বিভাগের ছাত্র সংখ্যার তুলনায় এই কুতুবখানা আরও প্রসারিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন। অর্থের সংস্থান হইলে কুতুবখানাকে যথার্থরূপে গঠন করার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের রহিয়াছে।

এই বিভাগের ছাত্রগণও খোরাক এবং বাসস্থান বিনামূল্যেই লাভ করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর এই মাদ্রাছাহ্ হইতে বহু ছাত্র নাম মাত্র ব্যয়ে হাদীছ ও তফছিরের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইতেছেন। বাংলার নিভৃত পল্লীতে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া পীর ছাহেব যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন উহা ইছলামের সেবার একটি অমর কীর্তিরূপে যুগ যুগ ধরিয়া বিরাজ করিবে।

হেফ্‌জুল কোর্‌আন বিভাগ

শর্ষিণা দারুছ্ ছুন্নৎ আলীয়া মাদ্রাছার সঙ্গে একটি হেফজুল কোরআন বিভাগ খোলা হয়। পাক কোরআন মজিদ হেফ্‌জ করা ইছলামী শিক্ষার অন্তর্গত একটি শিক্ষা। পৃথিবীর সকল মুছলিম অধ্যুষিত দেশে ইহার প্রচলন রহিয়াছে। কোরআন মজিদ যাহারা হেফ্‌জ করেন তাঁহাদের প্রয়োজন ও সমাদর উভয়ই রহিয়াছে। কাজেই এই বিভাগটি খোলার দিকেও পীর ছাহেবের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এবং একজন উপযুক্ত হাফেজের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রধান মাদ্রাছাহ দালানের একটি বর্দ্ধিত বাহুতে এই মাদ্রাছাহ্ বসিয়া থাকে। প্রতি বৎসরই এই মাদ্রাছাহ হইতে কিছু সংখ্যক ছাত্র হেফ্‌জ সমাপ্ত করিয়া বাহির হইতেছেন।

পীর ছাহেব এই হেফ্‌জুল কোর্‌আন বিভাগটি বড়ো ভালবাসিতেন। তিনি যেখানে উপবেশন করিতেন সেখান হইতে অনতিদূরে, অথচ উচুঁ স্থানে মাদ্রাছার দ্বিতলে এই মাদ্রাছাহ্ বসিয়া থাকে। বহু সংখ্যক ছাত্রের সুললিত কণ্ঠে কোরআন পাক আবৃত্তির ঝংকার পীর ছাহেবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত। তিনি সময়ে পরম হৃষ্টমনে ছেলেদের এই আবৃত্তি শ্রবণ করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি দু'একটি ভালছাত্র ডাকিয়া আনিয়া দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত আবৃত্তি শ্রবণ করিতেন। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ মন লইয়া কচি কণ্ঠে পাক কালাম মজিদের আবৃত্তি যে

ছাত্রের উপযোগী দর্ছি কেতাব সংগৃহীত হইয়াছে। এই লাইব্রেরী গঠনে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ মাত্র ছয় হাজার টাকা।

অবশিষ্ট অর্থ দানশীল দীনদার মুছলমানগণের নিকট হইতে চাঁদা স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। কেহবা একটি ছাত্রের সম্পূর্ণ কেতাব অথবা উহার মূল্য দান করিয়া এই মহান কাজের সঙ্গী হইয়াছেন। অবশ্য টাইটেল বিভাগের ছাত্র সংখ্যার তুলনায় এই কুতুবখানা আরও প্রসারিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন। অর্থের সংস্থান হইলে কুতুবখানাকে যথার্থরূপে গঠন করার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের রহিয়াছে।

এই বিভাগের ছাত্রগণও খোরাক এবং বাসস্থান বিনামূল্যেই লাভ করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর এই মাদ্রাছাহ্ হইতে বহু ছাত্র নাম মাত্র ব্যয়ে হাদীছ ও তফছিরের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইতেছেন। বাংলার নিভৃত পল্লীতে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া পীর ছাহেব যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন উহা ইছলামের সেবার একটি অমর কীর্ত্তিরূপে যুগ যুগ ধরিয়া বিরাজ করিবে।

হেফ্‌জুল কোর্‌আন বিভাগ

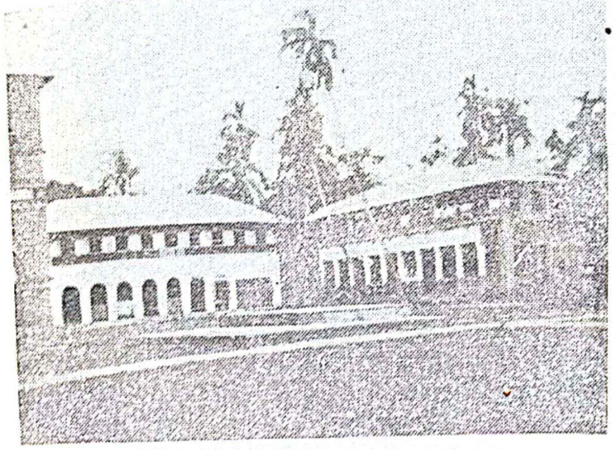
শর্ষিণা দারুছ্ ছুন্নৎ আলীয়া মাদ্রাছার সঙ্গে একটি হেফজুল কোরআন বিভাগ খোলা হয়। পাক কোরআন মজিদ হেফ্‌জ করা ইছলামী শিক্ষার অন্তর্গত একটি শিক্ষা। পৃথিবীর সকল মুছলিম অধ্যুষিত দেশে ইহার প্রচলন রহিয়াছে। কোরআন মজিদ যাহারা হেফ্‌জ করেন তাঁহাদের প্রয়োজন ও সমাদর উভয়ই রহিয়াছে। কাজেই এই বিভাগটি খোলার দিকেও পীর ছাহেবের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এবং একজন উপযুক্ত হাফেজের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রধান মাদ্রাছাহ দালানের একটি বর্দ্ধিত বাহুতে এই মাদ্রাছাহ্ বসিয়া থাকে। প্রতি বৎসরই এই মাদ্রাছাহ হইতে কিছু সংখ্যক ছাত্র হেফ্‌জ সমাপ্ত করিয়া বাহির হইতেছেন।

পীর ছাহেব এই হেফ্‌জুল কোর্‌আন বিভাগটি বড়ো ভালবাসিতেন। তিনি যেখানে উপবেশন করিতেন সেখান হইতে অনতিদূরে, অথচ উচুঁ স্থানে মাদ্রাছার দ্বিতলে এই মাদ্রাছাহ্ বসিয়া থাকে। বহু সংখ্যক ছাত্রের সুললিত কণ্ঠে কোরআন পাক আবৃত্তির ঝংকার পীর ছাহেবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত। তিনি সময়ে পরম হৃষ্টমনে ছেলেদের এই আবৃত্তি শ্রবণ করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি দু'একটি ভালছাত্র ডাকিয়া আনিয়া দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত আবৃত্তি শ্রবণ করিতেন। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ মন লইয়া কচি কণ্ঠে পাক কালাম মজিদের আবৃত্তি যে

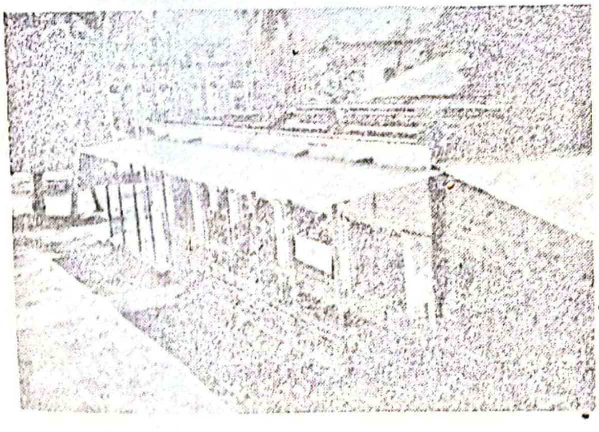
শ্রবণ করে নাই, সে কালাম পাকের সম্মোহনী শক্তি সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে পারে নাই। পীর ছাহেব এই আবৃত্তি যেরূপ গভীর তন্ময়ের সহিত শ্রবণ করিতেন তাহা দেখিলে মনে হইত যেন পীর ছাহেবের দেহে শ্বাস বহিতেছে না। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া দাড়ি ভিজিয়া যাইত। যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেন। আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিকগণের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।

শর্ষিণার পরবর্ত্তী পরিণতি

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সময়ের রিপোর্ট ও মন্তব্য সমূহ আপনাদের সামনে পেশ করিয়াছি উহা প্রায়ই বিভাগ পূর্ব্বকালের। সে সময় হইতে শর্ষিণা এখন আরও বহু সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে। মাদ্রাছাহ ও বোর্ডিং এর বিভিন্ন দিক সম্প্রসারিত হইয়াছে, প্রতিষ্ঠানের আয়তন এবং ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা এখানে উহার একটু মোটামুটি আভাস দিয়া ক্ষান্ত হইব। বিভিন্ন পরিদর্শকগণের মন্তব্যে লিল্লাহ বোর্ডিংএর ছাত্র-সংখ্যা একশত হইতে তিন শতের মধ্যে ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তখনকার বোর্ডিংএর মাসিক ব্যয়-বরাদ্দ ছিল মাত্র পাঁচ ছয় শত টাকা। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই বোর্ডিংএর ছাত্র সংখ্যা স্থায়ীভাবে তিন শত হইতে চারি শতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার মাসিক ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ছয় হাজার টাকার উর্দ্ধে।



শর্ষিনার মরহুম পীর ছাহেবের মোছাফের খানা ও বিভিন্ন দফ্তর



উপর হইতে মছজিদ ও মাদ্রাছাহ-প্রাঙ্গণের একাংশের দৃশ্য

ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মাদ্রাছাহ কর্তৃপক্ষকে আর একটি নূতন একতালা দালান নির্ম্মাণ আরম্ভ করিতে হয়। এই দালানের কাজ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত দশ হাজার টাকার অধিক ব্যয়ে মোট ২০৫ ফুট দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট কাঁচা ও পাকা ভিত-ওয়ালা তিনটি গৃহ ছাত্রাবাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাত্রদের খাইবার গৃহের দৈর্ঘ্য আটাত্তর ফুট এবং ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় ছয় হাজার টাকা। মাদ্রাছার শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণের খাইবার গৃহ পৃথক। এতদ্ব্যতীত পাকা মছজিদ ও প্রাইমারী পাঠশালা গৃহ রহিয়াছে।

অতিথি মেহমানদের থাকিবার জন্য বার হাজার টাকা ব্যয়ে একটি একতালা পাকা ডাকবাংলা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পীর ছাহেবের প্রতিবেশী, দানশীল হাজী মরহুম রাজা আলী ছাহেব এই ডাকবাংলাটি নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি গভীর সহানুভূতির প্রমাণ দেন। ইহা ছাড়া মরহুম পীর ছাহেবের নিজ ব্যয়ে আর একটি দ্বিতল মোছাফেরখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পীর ছাহেবের নিজস্ব পাকা কুতুবখানা, কাঁচা বাবুর্চি খানা, দারুচ্ছুন্নাৎ পাকা ডাক-ঘর, মাদ্রাছার পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি মাদ্রাছার প্রধান এলাকায় অবস্থিত। এই প্রাঙ্গণে তিনটি বড় পুষ্করিণী রহিয়াছে। উহার মধ্যে একটি তলা হইতে পাকা ভিত্ বাঁধানো পানীয় পানির জন্য রক্ষিত। বাকী কয়টি ওজু, গোছল ও কাপড় ধোওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তিনটি পুষ্করিণীতেই পাকা শান বাঁধানো ঘাট রহিয়াছে।

মাদ্রাছাহ্ ও বোর্ডিং এলাকায় বড় বড় চারিটি খোলা প্রাঙ্গণ রহিয়াছে। উহার প্রধান প্রাঙ্গণ মাদ্রাছাহ্, মছজিদ, মোছাফের খানা ও একটি রাস্তা দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাঙ্গণে বার্ষিক ইছালে ছওয়াবের মাহফিল বসিয়া থাকে। বার্ষিক মাহফিল সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ মাহফিলে আগত মেহমানদিগকে খানা খাওয়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় প্রাঙ্গণ বোর্ডিংএর সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। মাহফিলের সময় এই সমগ্র প্রাঙ্গণগুলিই লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বার্ষিক সভায় এই বিশাল প্রাঙ্গণটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নামাজের সুদীর্ঘ কাতারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

চতুর্থ প্রাঙ্গণ মাদ্রাছাহ্ বাটির বাহিরে বোর্ডিংএর পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত। এই প্রাঙ্গণে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি পুষ্করিণী অবস্থিত। এই প্রাঙ্গণটির এক পার্শ্ব দিয়া পাকা ডিঃ বোর্ড রাস্তা, উত্তরে স্বরূপকাঠী নদী ও দক্ষিণে স্বরূপকাঠী থানা পর্য্যন্ত যোগাযোগ সাধন করিতেছে। এই প্রাঙ্গণে বার্ষিক মাহফেলের সময় আগত সহস্র সহস্র মেহমানদের সুবিধার্থে চা-পানি, খাদ্য ও ফল-ফলাদির দোকান-পাট বসিয়া থাকে। বৎসরের অন্যান্য সময় এই স্থানটি বিচরণ ও বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাদ্রাছার প্রধান এলাকা হইতে অনতিদূরে পাকা-রাস্তা সংলগ্ন স্বরূপকাঠী নদী প্রবাহিত। নদী তীরে শর্ষিণা ষ্টীমার

ষ্টেশন। নদীর উত্তর তীর ঘন-শ্যামল ফলবান বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই নদীর তুলনা নাই। ছাত্রাবাসের দ্বার-প্রান্ত হইতে নদী তীরে অবস্থিত ষ্টীমার ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলা-চলের জন্য পাকা রাস্তা রহিয়াছে। মাদ্রাছার ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্যান্য লোকজন এই রাস্তাটি বাহিয়া নদী তীরের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে আসেন। নদী তীরবর্ত্তী প্রাঙ্গণটি মাদ্রাছাহ বাটির একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এখানে মাদ্রাছার নিজস্ব ছাপাখানা, ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী আবশ্যকীয় জিনিস পত্রের একটি সমবায় দোকান, খাদ্য-খাদকের হোটেল, বুক-বাইডিং কারখানা ও সেলাই ঘর প্রভৃতি রহিয়াছে। স্থানটি একটি পতিত জমি ছিল। মাদ্রাছার প্রয়োজনে কয়েক সহস্র টাকা ব্যয়ে এই পতিত স্থানটি ভরাট করিয়া এই মনোরম মাঠ তৈয়ার করা হইয়াছে। মাদ্রাছার স্বাস্থ্যের পক্ষে এই প্রাঙ্গণটি প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে গণ্য।

এই সকল এমারত, গৃহাদি, পুষ্করিণী ও রাস্তা এবং মাদ্রাছাহ্ প্রাঙ্গণের অনতিদূরে অবস্থিত জমিতে অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীগণের কোয়ার্টার ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির উপরে ছড়াইয়া আছে। বিগত পয়ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান এই পরিণতিতে পৌছিয়াছে। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিতে এযাবৎ প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই বিপুল-সংখ্যক টাকার প্রায় সবই বলিতে গেলে দেশের জন-সাধারণ যোগাইয়াছে। পীর ছাহেবের কর্ম্ম-নিষ্ঠা এবং সততার উপর

লোকের অগাধ আস্থা না হইলে অকুণ্ঠিতভাবে এই অর্থ কিছুতেই পীর ছাহেবের হাতে দিত না। কেবল অর্থই নহে, এই প্রতিষ্ঠান গড়িতে বহুলোক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত যে বিপুল দৈহিক শ্রম দান করিয়াছেন তাহার মূল্যও সামান্য নহে।

মাদ্রাছার শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য

সরকার পরিচালিত আলীয়া মাদ্রাছার অনুসরণেই শর্ষিনা আলীয়া মাদ্রাছার পাঠ্য-তালিকা অনুসরণ করা হইয়া আসিতেছে। অবশ্য ইহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই। কিন্তু পীর ছাহেব চাহিয়াছিলেন, মাদ্রাছার শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেকটি ছাত্রের ব্যক্তিগত জীবনের যোগ সাধন করিতে। বর্ত্তমান যুগের আব-হাওয়ায় মাদ্রাছার ছাত্ররাও বহুস্থানে তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ হারাইয়া ফেলে এবং এলমের সঙ্গে আমলের কোনই সম্পর্ক থাকে না। পীর ছাহেব ইহা তাঁহার মাদ্রাছায় হইতে দেন নাই। কারণ পীর ছাহেবের উদ্দেশ্য ছিল দেশে একদল হাদী আলেম গঠন করা। এল্‌মে ও আমলে পরিপক্ক না হইলে হেদায়েতের মতো কঠিন কার্য্য কখনও সমাধা হয় না। আদর্শহীন আলেমই সমাজে যতো অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার প্রতিকার শুধু শরিয়তের আদর্শে পূর্ণ নিষ্ঠাবান আলেম দ্বারাই হইতে পারে।

এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া পীর ছাহেব তাঁহার মাদ্রাছার ছাত্রগণকে প্রথম হইতেই আমলের প্রতি আপোষহীন নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শরিয়তের হুকুম পালনে অভ্যস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে যখন তাঁহারা এলেম শিক্ষা করিয়া সমাজের সম্মুখে বাহির হইবে, তখন যেন তাঁহারা সমাজের ও ইছলামের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করাই যেন তাঁহাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য হয়। মোটকথা, পীর ছাহেব তাঁহার নিজ জীবনের ধ্যান-ধারণা প্রত্যেকটি ছাত্রের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে যেমন মাদ্রাছার নিয়মিত পাঠের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনই ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনে ইছলামের নির্দেশগুলি পালন করাইবার প্রতি পিতৃ-সুলভ স্নেহ দৃষ্টি রাখিতেন।

নামাজ

হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—

الصلوة عماد الدين

নামাজ দীনের স্তম্ভ।

ইছলামী জিন্দেগীতে নামাজের স্থান কলেমার পরেই। কলেমার দ্বারা মৌখিক ও আন্তরিক যে স্বীকৃতি ঘোষণা করা হয় নামাজ তাহা কার্য্যতঃ প্রমাণ করে। নামাজ শ্রেষ্ঠ এবাদত। ইছলামী জিন্দেগীতে নামাজ বাদ পড়িলে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট

থাকে না। এই জন্য কোর্আন মজিদে নামাজের এত বেশী তাকীদ এবং হাদিছে ইহার বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কি, হাদিছ শরীফে নামাজকে ইছলামের স্তম্ভ বলা হইয়াছে। পীর ছাহেব কেবলা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে নামাজকে যথার্থ গুরুত্ব সহকারে পালন করিতেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নামাজের জন্য কঠোর তাম্বিহ্ করিতেন।

তিনি তদীয় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাছায় নামাজকে যথার্থভাবে কায়েম করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা সজাগ-দৃষ্টি ও চেষ্টার ফলে মাদ্রাছার ছাত্র, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়া এমন একটি মহান শিক্ষা ও আদর্শকে জীবন দান করিয়া গিয়াছেন যাহার তুলনা দুর্লভ। অবশ্য নামাজ এবং জমাত, ইহা মোছলমানের জন্য অভিনব কিছুই নহে। ইছলামের ইহা চিরন্তন শিক্ষা ও আদর্শ। মুছলমান ইহার গুরুত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল, তিনি ইহা একটি কেন্দ্রে কায়েম করিবার জন্য সারা জীবন বরং জীবনের প্রতিদিন ইহার পশ্চাতে লাগিয়াছিলেন। পরিণামে তিনি নিজ কর্ম্ম-কেন্দ্রে ইহা যথার্থরূপে বহাল করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, একটি কেন্দ্রে অবস্থিত প্রায় হাজার খানেক লোক বিভিন্ন কার্য্যে রত থাকা স্বত্বেও আজানের শব্দ ধ্বনিত হওয়া মাত্র তাহাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, তর্ক ও তক্রার, লেখা ও পড়া, ক্রয় ও বিক্রয়, নিদ্রা ও বিশ্রাম ইত্যাদি সকল কাজ মুহূর্ত্তে শিথিল হইয়া যায় এবং নামাজের জমাতের জন্য সর্ব্বত্র ব্যস্ততার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ 'হাজত' সারিয়া সারি সারি মছজিদে সমবেত হয় এবং জমাতের সহিত সকলেই নামাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু ইহা একদিনে হয় নাই। পীর ছাহেব জীবনের শেষ দিনগুলিতেও অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়া নামাজ এবং জমাতের জন্য কঠোর তাম্বিহ্ করিয়া গিয়াছেন। কেবল শর্ষিণা মাদ্রাছায়ই নহে, তাঁহার জীবনের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই তিনি ইছলামী জিন্দেগীর মহান অবদান এবং আল্লাহ পাকের অলঙ্ঘনীয় বিধান এই নামাজের প্রচার ও পুনর্জ্জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা মরহুম কেবলার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে বিষয় আলোচনা করিব। এখানে মাদ্রাছার ছাত্রগণকে তিনি কিভাবে নামাজে অভ্যস্ত করাইতেন তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মাদ্রাছার পাঠের ন্যায় জমাতের সহিত নামাজ আদায় করাও বাধ্যতা-মূলক করা হইল। জমাতের জন্য ফজর ও এশার নামাজের পরে হাজেরীও করা হইল। ইহা কেবল নিয়মই ছিল না, বরং ইহা কি পরিমাণ কার্য্যে পরিণত হইত তাহা দেখিবার জন্য মাদ্রাছার শিক্ষকগণের উপর ভার অর্পিত হইল। কেবল এতটুকু করিয়াই পীর ছাহেব তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না। তিনি নিজেই ইহার তদারক করিতেন। যখনই ইহাতে কোন শিথিলতা দেখা যাইত তিনি প্রতিবিধান করিতেন এবং কৈফিয়ৎ 'তলব' করিতেন। নামাজের জমাতে গাফ্লতি দেখিলে সময়ে তিনি এরূপ রাগান্বিত হইতেন এবং গর্জ্জন করিতেন যে, কাহারও টু' করিবার সাহস হইত না।

আবার তিনি শান্ত হইয়া সকলকে বুঝাইতেন, নামাজের 'ফজিলং' বর্ণনা করিতেন। রছুলোল্লাহ নামাজ ও জমাতের জন্য কি তাকিদ করিয়া গিয়াছেন, তিনি কি 'ওছওয়াতে-হাছানা' আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতেন। অধিকাংশ সময় মছজিদেই এই জলছাহ্ হইত। অতঃপর ভবিষ্যতে এরূপ ত্রুটী পুনঃ না হয়, জমাত কাজা না হয় ও নামাজে 'মছবুক' না হয়, এইজন্য সকলেই পীর ছাহেব কেবলার হাতে তওবা ও ওয়াদা করিয়া লইতেন।

মাঝে মাঝে ফজরের নামাজের পরেই কিছু সংখ্যক লোক ছাত্রদের বোর্ডিংএ প্রেরণ করিয়া খোঁজ লইতেন। যাহারা ঘুমাইয়া থাকিত এবং নামাজে হাজির হইতে পারিত না, তাহাদের সাবধান করিতেন।

নামাজে মছবুক ও গায়ের হাজের ছাত্রদের জন্য শাস্তি স্বরূপ খোরাকী বন্ধের ব্যবস্থাও করাইতেন, কিংবা মোদাররেছ ছাহেবান কোন শাস্তি প্রয়োগ করিলে উহা অনুমোদন করিতেন।

তিনি কখনও জোহর কি আছরের নামাজের পরে ছাত্রদের নামাজের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। নামাজ, অজু ও পাক পাকিজার মছলা জিজ্ঞাসা করিতেন। সময়ে কাহাকেও নামাজের কোনও রোকন আদায় করিয়া দেখাইতে বলিতেন, কখনও বা নিজেই দাঁড়াইয়া রোকন-বিশেষ আদায় করিয়া দেখাইয়া দিতেন। অসংখ্য গুরুত্ব-পূর্ণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই সবও করিতেন। কেবল যে দুই চারি দিন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন এমন নহে, বরং

সারা জীবনই এইভাবে ছাত্রদের নামাজ ও জমাত সম্পর্কে কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন। ফলে মাদ্রাছাহ্ বোর্ডিং এর সকল ছাত্রই নামাজ ও জামাতের মর্য্যাদা শিক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং উহা তাঁহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাইতেছে।

ঢিলা কুলুখ

হজরত পীর ছাহেব কেবলার জীবন কাহিনীতে ঢিলা-কুলুখের প্রসঙ্গ কেহ কেহ অবাঞ্ছিত মনে করিতে পারেন। কেননা ইহা শরিয়তের একটি ক্ষুদ্র বিষয়। কিন্তু প্রিয় পাঠক! পীর ছাহেবের জীবনী হইতে এই প্রসঙ্গ বাদ দিলে তাঁহার জীবনের প্রতি অমর্য্যাদা করা হইবে। শরিয়তের ছোট খাটো নির্দ্দেশ গুলিকে আমরা যতোই ছোট ভাবি না কেন, পীর ছাহেব উহাকে কখনও ছোট বলিয়া দেখেন নাই। তিনি ইছলামের শিক্ষা এবং হজরত রছুলোল্লাহ (দঃ) এর তরীকাকে প্রাণতুল্য মোহাব্বৎ করিতেন। উহার একটিও অঙ্গহীন হইতে দেখিলে তিনি দুঃখে ও বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেন। সুতরাং যেখানে পীর ছাহেবের ক্ষমতা চলিত, সেখানে তিনি ছুন্নতে রছুলুল্লাহর কোনও ব্যতিক্রম বরদাশত করিতেন না। বরং যতোই চেষ্টা, অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় হউক তিনি উহা বহাল করিবার চেষ্টার কোনও ত্রুটী করিতেন না। সত্যিকার আশেকে রছুল ছিলেন তিনি। তাই ইছলামের বিধি বিধানের প্রতি তাঁহার মমতা ও কর্ত্তব্য-বোধ তেমনি প্রখর ছিল। কাজেই ঢিলা কুলুখের

ন্যায় একটি ক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি জীবনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া দেখিতেন। তিনি নিজের জীবনে উহা আমল করিতেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমল করিবার তাকিদ দিতেন। সুতরাং মাদ্রাছার ছাত্রগণের জন্যও শরিয়তের এই আমলটি শিক্ষা দিতে যত্নবান হইতেন। তিনি এই ক্ষেত্রে কেবল মৌখিক নছিহত ও নির্দ্দেশ দিয়াও নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। ছাত্র শিক্ষক ও সকল আগন্তুকগণের ব্যবহারের জন্য তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে ও অর্থব্যয়ে রাশি রাশি মাটির ঢিলা তৈয়ার করাইয়া রাখিতেন এবং সকলকে ইহা ব্যবহার করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। শরিয়তের বিধান মতে ঢিলা কুলুখের ব্যবহার পাক-পাকিজার জন্য একান্ত প্রয়োজন। ইহা কিছু নূতন কথাও নহে। নূতন কথা হইতেছে এই টুকুই যে, শরিয়তের কোনও একটি আমল যখন চর্চ্চার অভাবে লোপ পাইবার উপক্রম হয়, তখন উহাকে পুনরায় বহাল করা এবং উহার গুরুত্ব জাগাইয়া তোলা। ইহাই মোজাদ্দেদের কাজ। যাহা হউক, পীর ছাহেব ছাত্রদিগকে পাক-পাকিজার তালীমের জন্য ছাত্রদিগকে উক্ত ঢিলা কুলুখের মছলাটি আমল করাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

লেবাছ-পোষাক

ইছলামী লেবাছ-পোষাকের প্রতি পীর ছাহেবের আন্তরিক ভালবাসা ছিল। তিনি লেবাছ-পোষাকে রছুলোল্লাহের তরিকা

অনুসরণ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। পীর ছাহেব লেবাছ সম্পর্কে প্রায়ই এই হাদিছ শরীফটী বলিতেন—

من تشبه بقوم فهو منهم

অর্থাৎ "যে যে জাতির অনুকরণ করিবে, সে পরকালে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে।" এই অনুকরণপ্রিয়তা অন্যান্য কাজের বেলায়ও যেমন, পোষাক-পরিচ্ছদেও তেমনি। কাজেই তিনি রছুলোল্লাহের আদর্শ অনুযায়ী লেবাছ পরিধান করা জরুরী মনে করিতেন এবং মাদ্রাছার ছাত্রগণকে ইহার জন্য উৎসাহিত করিতেন। দিনী এলমের শিক্ষার্থী ছাত্ররা যুগের আব-হাওয়ায় সংক্রামিত হইয়া বিলাস পরায়ণ ও সৌখিন হইয়া না উঠে, এবং ছুন্নাতী লেবাছকে বর্জ্জন করিয়া যা' ইচ্ছা তাই করিতে শুরু না করে এই জন্য পীর ছাহেব কড়া তাম্বিহ করিতেন। সুতরাং সর্ব্বদা মাথায় টুপি পরিধান করা, হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত অর্থাৎ "নেছফে-ছাক" কোরতা এবং কল্লিদার পাজামা ও পাগড়ী ব্যবহার করিবার আদর্শ শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করিয়া তিনি দেখিতেন যে, পরিধেয় পাজামা বা লোঙ্গী পায়ের গ্রন্থির উপরে যথাস্থানে রহিয়াছে কি না, কারণ, পুরুষের পক্ষে পায়ের গ্রন্থির নিম্নে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলাইয়া দেওয়া হারাম, ইহা অহঙ্কারের লক্ষণ! তিনি এরূপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাবধান করিতেন এবং শোধরাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মছলা বলিয়া দিতেন। এই ভাবে তিনি ছাত্রদিগকে হামেশা ছুন্নাৎ অনুযায়ী লেবাছ-পোষাক পরিধান করিতে উৎসাহিত

করিতেন। ফলে মাদ্রাছার সকল ছাত্র একই আদর্শে তাক্ওয়ার লেবাছ গ্রহণ করিতে অভ্যস্থ হইয়া আসিতেছে।

বিড়ি-সিগারেট ঃ

মাদ্রাছার ছাত্ররা বিড়ি সিগারেট পান না করে তৎপ্রতি পীর ছাহেবের কঠোর নির্দ্দেশ ছিল। অবশ্য কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রদের ধূমপান বৈধ মনে করা হয় না এবং ছাত্ররা শিক্ষকগণের সম্মুখে সচরাচর ধূমপান করে না ইহা সত্য বটে, কিন্তু বর্ত্তমান দুনিয়ায় ধূমপানের ব্যাধি এরূপ ব্যাপক যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও শিক্ষকগণের দৃষ্টি এড়াইয়া আড়ালে কিংবা বোর্ডিং-এ যথেচ্ছ ধূমপান করা হইয়া থাকে। পীর ছাহেব এই ব্যাপারে কোনও গোজামিল প্রশ্রয় দেন নাই। ধূমপান শরিয়তের মছলা অনুসারে মক্রুহ্ তাহ্রীম কিংবা মতান্তরে মক্রুহ্। অবশ্য পীর ছাহেব ইহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মক্রুহ্ তাহ্রীম সাব্যস্ত করিতেন। সুতরাং এতদুভয়ের যেটিই হউক না কেন, ইহা শরিয়তে খেলাফ্ কার্য্য এবং অপব্যয়। সুতরাং মাদ্রাছার ছাত্ররা প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনও প্রকারেই ইহা করিতে পাইত না। পীর ছাহেবের তালীমের গুণে শর্ষিনা মাদ্রাছার ছাত্র-শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তিই ধূমপান করেন না। বলিতে গেলে ধূমপান শর্ষিনা হইতে চির নির্ব্বাসন লাভ করিয়াছে। শর্ষিনা মাদ্রাছাহ ও উহার বিরাট কর্ম্ম-প্রাঙ্গণের সীমার ভিতরে একটি বিড়ি জ্বালাইয়া ফুঁকিবার সাহস কাহারও

হয় না। ইহা পীর ছাহেবের অসামান্য প্রভাব এবং তাঁহার আদর্শের প্রতি প্রত্যেকটি অনুসরণকারীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ব্যতীত সম্ভব হইতে পারিত না।

দাড়ি রাখা ও চুল কাটা

মাথার চুল সমান করিয়া কাটা কিংবা বাবড়ী রাখাই রছুলোল্লাহ্র তরিকা—ছুন্নৎ। ইহার ব্যতিক্রম আলফেট রাখা ছোট বড়ো করিয়া চুল কাটা বেদাত। পীর ছাহেব মাদ্রাছার ছাত্রদিগকে এই বিষয়েও সতর্ক করিতেন। কোনও ছাত্রের মাথায় ছুন্নতের খেলাফ্ সম্মুখের দিকে লম্বা চুল থাকিলে তাহা তখনই শোধরাইতেন। বয়স্ক ছেলেদের দাড়ি ছাটা-কাটার প্রতিও তিনি দৃষ্টি দিতেন। কেহ দাড়ি কামাইলে কিংবা ছাটিলে তাহাকে শাসন করিতেন। সুতরাং ছাত্রদিগের ছুন্নৎ তরিকা অনুযায়ী চুল কাটা ও দাড়ি রাখা ব্যতীত অব্যাহতি ছিল না। এই ভাবে তিনি শরীয়তের নির্দ্দেশ মতে ফরজ, ওয়াজেব ও ছুন্নৎ সমূহ ছাত্রদের দ্বারা আমল করাইতেন। তিনি জীবন ভরিয়া এই খেদমত করিয়া গিয়াছেন। কখনও ক্লান্ত হন নাই বা হতাশ হন নাই। এই সকল বিষয়ের ভিতর দিয়া তিনি ইছলামী তালীম ও শরীয়তের আমলের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই শিক্ষা যে কেবল ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত তাহা নহে, বরং ছাত্রদের যাহারা শিক্ষক এবং অন্যান্য যাহারা নানা উপলক্ষে

পীর ছাহেবের নিকট আসিতেন, তাঁহাদের সকলের জন্যই এই শিক্ষা কাজে লাগিত। এই তা'লীমের দ্বারা শাসন কেবল ছাত্রই হইল না, বরং ছাত্রের শিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া পীর ছাহেবের কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্ম্মী, বক্তা, লেখক, দরজী, দোকানদার, বাবুরচি ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি সকলেই ছুন্নৎ তরিকার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেন।

সুতরাং শর্ষিনায় অবস্থানকারী যে কোনও ব্যক্তির জমাত তরক করা, নামাজের ওয়াক্তে ঘুমাইয়া থাকা, দাড়ি কাটা, ধূমপান করা, লম্বা চুল রাখা এবং ছোট জামা পরিধান করা সম্ভব হয় নাই। পীর ছাহেবের শিক্ষার গুণে শর্ষিনায় উহা কোনও দিনই স্থান পায় নাই।

ছাত্রদের পাঠ ও জ্ঞান-চর্চ্চা

ছাত্রদের নিয়মিত পড়া-শুনা ও বাহ্যিক জ্ঞান-চর্চ্চার প্রতিও পীর ছাহেবের সমান দৃষ্টি ছিল। মাদ্রাছার ঘণ্টায় কোনও ছাত্র বাহিরে চলাফেরা করিলে তিনি তাহাও দেখিতেন এবং সতর্ক করিতেন। কখনও বা হঠাৎ একা বাহির হইয়া বোর্ডিংএর বারান্দায় ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতেন। তিনি পড়া-শুনার প্রতি ছাত্রদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। পাঠে যোগ্যতা, সচ্চরিত্রতা এবং নামাজে নিয়মিত হাজেরীর জন্য বার্ষিক সভায় ছাত্রদের এনাম দেওয়ার ব্যবস্থা হইত। তিনি বহু সভায় নিজ হাতে ছাত্রদিগকে এনাম বিতরণ করিতেন। এইরূপে তিনি ছাত্র ও ছাত্রের অভিভাবকগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন।

তিনি ছাত্রগণ দ্বারা ওয়াজ নছিহত করাইতেন। ফলে যে ছাত্র ভাল ওয়াজ করিতেন, সময়ে তাহাকে নিজ সঙ্গে করিয়া বাহিরের ছফরে লইয়া যাইতেন এবং দেশের ছাত্ররা এরূপ শিক্ষা করিলে কিভাবে তাঁহারা ওয়াজ নছিহত করতঃ দেশ হেদায়েত করিতে সমর্থ হইবে সেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এই সকল ছাত্রকে পীর ছাহেব চুপে আর্থিক সাহায্যও করিতেন।

ছাত্রদের বিতর্কমূলক সাপ্তাহিক সভার অনুষ্ঠানে তিনি আগ্রহ সহকারে যোগদান করতঃ ছাত্রদের আলোচনা শুনিতেন এবং তিনি নিজেও মাঝে মাঝে এই সভায় অংশ গ্রহণ করিতেন।

মাদ্রাছার ছাত্রদের শরীর চর্চ্চা

ছতর অনাবৃত করিয়া শরীয়ৎ-বিরোধী না-জায়েজ খেলা-ধূলা তিনি মাদ্রাছার ছাত্রদের জন্য অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু শরীর চর্চ্চার জন্য লাঠি ভাজা, তলোয়ার ভাজা, ছোরা খেলা, ড্রিল, কুচ-কাওয়াজ এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি ছাত্রদের জন্য রাইফেল ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তানে বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত পরিবেশে মাদ্রাছার ছাত্রদিগকেও সাহস-শক্তিতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং দরকার হইলে ইছলাম ও পাকিস্তানের আজাদীর জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে, ইহা তিনি উপলব্ধি করিতেন। এই জন্য মাদ্রাছার সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, এমন কি নিজ পুত্রগণেরও তিনি রাইফেল চালনা শিক্ষা

বিশেষ আগ্রহ সহকারে অনুমোদন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মাদ্রাছার ছাত্রদের মধ্যে কয়েকটি আনছার প্লাটুন রহিয়াছে। তাহারা স্থানীয় রাইফেল ট্রেনিং কেন্দ্র হইতে রাইফেল চালনা ও কুচ-কাওয়াজ শিক্ষা করিয়া ছনদ অর্জ্জন করিয়াছেন। মাদ্রাছার ছাত্রগণের নিয়মিত তালীম দিবার জন্য একজন আনছার কমাণ্ডার মাদ্রাছায় বেতনভোগী হিসাবে রাখা হইয়াছে। তিনি ছাত্রদিগকে নিয়মিত কুচকাওয়াজ শিখাইয়া থাকেন। অবশ্য ইহা বর্ত্তমানের কথা। কিন্তু পীর ছাহেব বহু পূর্ব্ব হইতেই এই ধরণের শিক্ষাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং মাদ্রাছায় বহু মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অতীতে হইয়া গিয়াছে, উহা তিনি পরম তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিয়াছেন।

মোট কথা, সমাজের মঙ্গলজনক প্রত্যেকটি কাজেই পীর ছাহেবের উৎসাহ ও উদ্যম দেখা গিয়াছে এবং যতদূর সম্ভব তিনি উহা নিজ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শরীয়তের খেলাফ্ কার্য্যগুলি ছোট হউক, বড়ো হউক, সমূলে উৎপাটন করিতে সর্ব্বদা সজাগ রহিয়াছেন এবং ইছলামের শিক্ষাগুলিকে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিরামহীন কাজ করিয়া গিয়াছেন।

মাদ্রাছার ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ জীবনে পর-মুখাপেক্ষী না হইতে হয়, এই বিষয়েও তিনি জীবনে বহু চিন্তা করিতেন। অবশ্য মাদ্রাছার ছাত্রদের জন্য ইহা একটি চিরন্তন অভিযোগ রহিয়া

গিয়াছে। তাই বলিয়া মাদ্রাছাহ শিক্ষাকে সংকুচিত করা তিনি কোনও মতে সমীচীন মনে করেন নাই। কারণ, দীনি এলমের চর্চ্চা ব্যতীত ইছলাম টিকিয়া থাকিতে পারে না ইহাই ছিল পীর ছাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই তিনি প্রচুর মাদ্রাছাহ প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন।

মাদ্রাছার ছাত্ররা জীবনে যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি শর্ষিনা মাদ্রাছার সঙ্গে তিব্বি বিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ইহার উদ্বোধন কার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন বহুদর্শী হাকীমের পরামর্শ মতে মফঃস্বলে উহা সম্ভব করিয়া তোলা প্রায় অসম্ভব বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হইল। ইহা ছাড়া মাদ্রাছার ছাত্রদিগকে বয়ন শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। এই বিভাগটি কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ তৎপরতার সহিত চলিয়াছিল এবং কয়েক সহস্র টাকা এই কাজে ব্যয়ও করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝা গেল যে, এই বিভাগও ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ নহে ; সে ছাড়া নির্ভরযোগ্য পরিচালকেরও অভাব ঘটিল ; কাজেই সাময়িকভাবে উহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বলিবার কথা এই যে, সামাজিক প্রগতি এবং যে কোনও সদনুষ্ঠানে পীর ছাহেবের উদ্যমের অভাব ছিল না। নিজ মাদ্রাছায় হউক কিংবা অন্যত্রই হউক, শরীয়তের বিরোধী না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সকল ভাল কাজের উৎসাহদাতা এবং সাহায্যকারী ছিলেন।

একাধারে শিক্ষা, তৎসহ চরিত্র ও আমলের এরূপ সমন্বয় দেখিয়া যে কেহ এই প্রতিষ্ঠান দেখিতেন তিনিই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া যাইতেন এবং ভূয়সী প্রশংসাবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণের খেদমতে উহার কতিপয় অভিমত পেশ করিয়াছি।

মাদ্রাছার প্রভাব

যে যুগে ইছলামী শিক্ষা ও মানসিকতা লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল, তখন পীর ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাছাটি ছিল একটি 'জেহাদ'। এই মাদ্রাছাহ অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়া একটি আদর্শকে দেশের সামনে তুলিয়া ধরিল। এই মাদ্রাছার উপলক্ষে কোরআন ও হাদীছের মূল্য ও মর্য্যাদা, ইহার আদর্শ ও শিক্ষা একটি বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। এই মাদ্রাছাহ কেবল একদল আলেমই সৃষ্টি করিল না, বরং ইহা ইছলামী জিন্দেগীর একটি আদর্শ দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিল। একজন মুছলমানকে কিভাবে আল্লাহ ও রছুলের হুকুমের তাবেদারী করিতে হয় এবং আল্লাহর না-ফরমানী হইতে কিভাবে দূরে থাকিতে হয়, তাহা এই মাদ্রাছার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে লোকের সামনে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ করিল। মাদ্রাছাহ উত্তীর্ণ ছাত্রগণও পীর ছাহেবের বিশিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির গুণে এলেমের সঙ্গে সঙ্গে আখলাক ও আমলের গভীর অনুপ্রেরণা নিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই ছাত্রদের অনেকেই দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে মাদ্রাছাহ স্থাপন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শরীয়তের তা'লীমের প্রচার করিলেন এবং শেরক, বেদাৎ ও অন্যান্য অনাচার সমূহের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইলেন। এইরূপে এই মাদ্রাছার অস্তিত্বের সঙ্গে দেশময় একটি নির্ব্বিরোধ বিপ্লব—মূর্খতার বিরুদ্ধে একটি শান্তিপূর্ণ জেহাদ পরিচালিত হইল। যে সকল অনাচারের বিরুদ্ধে কাহারও কথা বলিবার সাহস পর্য্যন্ত হইত না, সেই সব অনাচার ধীরে ধীরে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। শর্ষিনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাছাহ ইছলামের লুপ্ত শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যকে এইভাবে একটি আন্দোলনের রূপে গড়িয়া তুলিল। ইহার ফলে দেশের জনসাধারণের মনে এই মাদ্রাছার প্রতি একটি দুর্লভ ভক্তির আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। পীর ছাহেব কেবলার প্রতি মোহব্বতের কারণেই হউক কিংবা শুধু মাদ্রাছার জন্যই হউক, অগণিত লোক ঐই মাদ্রাছাহকে একটি পবিত্র 'দরগাহ' স্বরূপ ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। পীর ছাহেবের খালেছ নিয়ত এবং ইহার পিছনে নিঃস্বার্থ খেদমত দেখিয়া নিশ্চয়ই লোকের অন্তরে এরূপ একটি বিশ্বাস হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং জনসাধারণ একান্ত প্রফুল্ল ও প্রশান্ত মনে এই মাদ্রাছায় আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ইহাই মাদ্রাছার প্রধান আয়। এলম ও আমলের সমন্বয় সাধনের ফলেই দেশবাসীর উপর এই মাদ্রাছাহ এরূপ অগাধ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মাদ্রাছার কারামত

পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা করিতেছি। কিন্তু মাদ্রাছার সম্পর্কে আর একটি বিষয় আলোচনা না করিলে মাদ্রাছার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; কাজেই এই বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আমরা ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

মাদ্রাছার আর্থিক সংস্থানের বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আভাস দিয়াছি। আরও একটি উপায়ে এই মাদ্রাছার আর্থিক সাহায্য আসিয়া থাকে। কল্পনাতীত উপায়ে এই সাহায্য আসিতে লাগিল। কিভাবে ইহা লোকের ধারণায় আসিল এবং বিশ্বাস জন্মিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে আমার এতটুকু মনে পড়ে যে, একদিন মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেব শর্ষিনা মাদ্রাছার বার্ষিক মাহফিলে ওয়াজ করিতেছিলেন। মাদ্রাছার প্রচার, উহার উন্নতি, উহার সৌষ্ঠব সাধন তাঁহার ধ্যানের ও কল্পনার বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "ভ্রাতৃগণ, এই মাদ্রাছাহ কেবল মাদ্রাছাই নহে, ইহা হজরত নূহ (আঃ)এর কিশ্‌তি স্বরূপ; দেশের নাজাত ও উদ্ধারের জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। আপনারা আল্লাহর নামে নিজ নিজ মকছুদের জন্য অনেক টাকা মান্নত করিয়া থাকেন। আপনারা আল্লাহর নামে এই মাদ্রাছার সাহায্যার্থে কিছু মানত করিয়া দেখুন! ইনশা আল্লাহ আপনাদের মকছুদ হাছেল হইবে।" ভাবাবেগ বশতঃই হউক কিংবা অদৃশ্য প্রেরণা হইতেই হউক, জনতার উপরে এই কথার একটা গভীর প্রতিক্রিয়া হইল এবং মাদ্রাছায়

টাকা, পয়সা, শস্য ইত্যাদি আল্লাহর নামে নিজ নিজ মকছুদ পূর্ণ হইবার জন্য মান্নত করিতে লাগিলেন। বহুলোক এই উদ্দেশ্যে টাকা নিয়া আসিতে লাগিলেন এবং জানাইতে লাগিলেন যে, তাহারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার জন্য মাদ্রাছায় আল্লাহর ওয়াস্তে টাকা মান্নত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর রহমতে সফল হওয়ায় তাঁহারা টাকা নিয়া আসিয়াছেন। এইভাবে কেহ মিথ্যা মামলা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, কেহ শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে, কেহ চাকুরী লাভের জন্য, কেহবা সুবিধা মতো স্থানে বদলী হইবার জন্য, কেহ বা বদলী রোধ করার জন্য, কেহ পুত্র কামনা করিয়া, কেহ বিবাহের জন্য, কেহ সৎপাত্রে কন্যাদানের জন্য, কেহ বেশী ফসল লাভ করার উদ্দেশ্যে, কেহ কঠিন রোগ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় এবং এই প্রকার অজস্র সৎকামনায় লোকে মাদ্রাছায় টাকা আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য সফল হইবার পরে লোকে টাকা নিয়া আসিয়া পীর ছাহেবের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিতেন, আমরা উহা শুনিয়া অবাক হইতাম এবং খোদার শোকর আদায় করিতাম।

জনৈক মওলবী ছাহেব পুত্র সন্তানের জন্য বড়ই ব্যাকুল ছিলেন। তিনি মাদ্রাছায় কিছু টাকা আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে একটি পুত্র সন্তান দিলেন। তিনি টাকা নিয়া পীর ছাহেবের নিকটে আসিয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তবেই আমরা জানিতে পারিলাম।

এক ব্যক্তির ক্ষেতের আক খেক শিয়ালে খাইয়া বড়ই ক্ষতি করিত। সে কিছু টাকা কি পয়সা আল্লাহর নামে মাদ্রাছার সাহায্যার্থে মান্নত করিল। উপদ্রব দমন হইলে সে উক্ত মান্নত আদায় করিল। এক ব্যক্তির গাছের নারিকেল কচি থাকিতেই ইঁদুরে কাটিয়া ফেলিয়া দিত। সে মাদ্রাছায় আল্লাহর নামে কিছু পয়সা মান্নত করিল; ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ হইলে সে পয়সা নিয়া আসিয়া ঘটনা বর্ণন করিল।

এক ব্যক্তি গরু দোহন করিতে পারিত না। গাভীটি ছুটাছুটি করিত। সে মাদ্রাছায় আল্লাহর নামে গরুর একদিন কি দুইদিনের দুধের পয়সা দিবার নিয়ত করিল। গরুটি শান্ত হওয়াতে পয়সা নিয়া আসিয়া ঘটনা বর্ণনা করিল।

এক বেপারীর চাউল সহ নৌকা ডুবি হইল। সে মান্নত করিল, "আল্লাহ! যদি চাউল সহ নৌকা পাই, তবে পীর ছাহেবের মাদ্রাছায় পঞ্চাশটি টাকা মান্নত করিব।" তাহার নৌকা ও চাউল উদ্ধার হওয়ার পর সে মান্নত আদায় করিল এবং ঘটনা জানাইয়া গেল।

একজন স্কুল ইন্সপেক্টর প্রায়ই কিছু টাকা মান্নত করিতেন। একদিন পীর ছাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন— "যে যে মকছুদের জন্য মাদ্রাছায় আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করি, আল্লাহ উহা পূর্ণ করেন সেই জন্যই এই সব টাকা দিয়া থাকি।"

একজন স্বনাম খ্যাত ব্যক্তি পত্রযোগে পীর ছাহেবকে জানাইলেন—'হুজুর আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আমি আপনার মাদ্রাছায় একশত টাকা মান্নত করিয়াছিলাম—আমি উহা আদায় করিব।" পরে যথা সময়ে তিনি উহা আদায় করিয়াছিলেন।

জনৈক উচ্চ শ্রেণীর জমিদার মাদ্রাছায় নানা উদ্দেশ্যে মান্নত ও আরও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ক্রমান্বয়ে পনর হাজার টাকা পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন।

এক নৌকার মাঝী আমাকে বলিল, "হুজুর! পীর ছাহেবের মাদ্রাছার বড় গুণ! বিদেশে একা নৌকায় জ্বরে বেহাল হইয়া পড়িলাম। কি করি, ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলাম। শেষে পীর ছাহেবের মাদ্রাছার এক টাকা চারি আনা মান্নত করিলাম— "আল্লাহ উদ্ধার কর। আল্লাহর এমন মেহেরবানী, আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল। আজ শরীরে সাবেক মতই বল পাইতেছি।" আমি নৌকায় চলিতে চলিতে মাঝীর মুখে এই ঘটনা তন্ময় হইয়া শুনিলাম।

পীর ছাহেবের জনৈক খলিফা, মাদারীপুর নিবাসী মওলবী আবদুল মজিদ ছাহেব বলেন, "একবার শর্ষিণা বার্ষিক ইছালে ছওয়াবের মাহফিলে মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেব ওয়াজ করিতেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি জনতাকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনারা এই মাদ্রাছায় নিজ নিজ মকছুদের জন্য, আল্লাহ্ ওয়াস্তে মান্নত করিয়া কোনও উপকার পাইয়াছেন কি না বলুন!" ইহার উত্তরে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন লোক নানা উদ্দেশ্যে মান্নতের কথা জানাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকাও আদায় করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া

জনৈক মওলবী ছাহেব মনে মনে ধারণা করিলেন যে, ইহা টাকা আদায় করিবার একটা কৌশল মাত্র। মূলে ইহা কিছুই নহে। অতঃপর মওলবী ছাহেব পরীক্ষার জন্য মনে মনে এমন একটি পুরাতন বিষয়ের জন্য দশটি টাকা মান্নত করিয়া রাখিলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস মতে ইহা উদ্ধার হইবার নহে। উক্ত বিষয়টি ছিল এই যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কন্যার একগাছি সোনার বালা একটি সুটকেসের ভিতর হইতে খোওয়া গিয়াছিল। বহু অনুসন্ধানেও উহা আর পাওয়া যায় নাই। মওলবী ছাহেব সন্দিগ্ধ মনে পরীক্ষার জন্য মান্নত করিলেন যে, "যদি তাঁহার কন্যার সেই হারানো বালা গাছি পাওয়া যায় তবে পীর ছাহেবের মাদ্রাছায় দশটি টাকা আল্লাহ্ ওয়াস্তে সাহায্য করিবেন।" কিন্তু তিনি মনে মনে ইহাও ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, উক্ত বালা আর পাওয়া যাইবে না।

সভার শেষে মওলবী ছাহেব নিজ বাড়ী গেলে তাঁহার কন্যা বলিল, "বাবাজান! আমার সেই হারানো বালা পাইয়াছি।" মওলবী ছাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় পাইলে মা?" কন্যা বলিল, "যে সুটকেস হইতে ইহা হারানো গিয়াছিল সেই সুটকেসেই পাইয়াছি।" কন্যা আরও বলিল, "এই সুটকেসের ভিতর ইহা বহুবার অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু এখন ইহা কিরূপে এই সুটকেসে আসিল তাহা ধারণা করিতে পারি না।" মওলবী ছাহেব তখন মাদ্রাছার কারামৎ সম্বন্ধে যে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন সেইজন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং যৎপরনাস্তি

বিস্মিত হইলেন। তিনি অতঃপর দশটি টাকা মাদ্রাছার তহবিলে দান করিলেন এবং পীর ছাহেবের সম্মুখে এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন। এই মওলবী ছাহেবের নাম ধাম সবই আমাদের জ্ঞাত।

কিন্তু দুনিয়ার সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার লোকে মান্নত করিয়া কোনও ফল লাভ করে নাই এবং আমরা এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী নহি যে, মাদ্রাছায় আল্লাহ ওয়াস্তে টাকা পয়সা মান্নত করিলে সবই উদ্ধার হইয়া যাইবে এবং আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতে কাহাকেও বলি না। বহুক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছে। তবে যাহারা এই ভাবে উপকৃত হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা সহস্র সহস্র এবং ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কেহ যদি ইহাকে প্রচারণা মনে করেন তবে উহা ভুল হইবে। পীর ছাহেবের জীবন ও কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া এরূপ একটি মহৎ বিশ্বাস লোককে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে উহা পীর ছাহেবের জীবনী গ্রন্থ হইতে বাদ দেওয়ার কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। কেননা, ছদকা ইছলামে অবৈধ নহে বরং বালা মুছিবৎ এবং নেক উদ্দেশ্য সফল হইবার জন্য আল্লাহর নামে অর্থ-সম্পাদ, হালাল জন্তু, রোজা, নামাজ ও হজ্জ ইত্যাদি মান্নৎ করার বিধান ও দৃষ্টান্তের কোনই অভাব নাই। কাজেই মাদ্রাছায় আল্লাহর নামে মান্নৎ করা কিছু অন্যায়ও নহে এবং যদি ইহার মারফতে আল্লাহ লোকগণের মকছুদ পূর্ণ করিয়া দেন তবে তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই।

যাহাই হউক, আমরা এখানে মাত্র ২১টি ঘটনা যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই জাতীয় অজস্র ঘটনার সাধারণ নমুনা মাত্র। আমরা ইন্‌শা আল্লাহ পীর ছাহেবের জীবনী গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এই সম্পর্কে আরও আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। আল্লাহ এইরূপ একটি অভিনব উপায়ে পীর ছাহেবের মাদ্রাছার সাহায্য পৌঁছাইয়া আসিতেছেন।

মাদ্রাছাহ না প্রাচীর

অনেকে এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, মাদ্রাছাহ্ একটি প্রাচীর মাত্র। এই সকল ঘটনা সমূহ পীর ছাহেবেরই কারামৎ। তিনি যে আল্লাহর একজন উচ্চ শ্রেণীর অলি ছিলেন ইহা তাহারই প্রমাণ। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত উচ্চস্তরের অলি দরবেশগণের এরূপ বহু আশ্চর্য্য কারামতের কথা মুছলিম জগতে বিদিত রহিয়াছে। ইছলামী আকায়েদ মতে ইহা বৈধ। সুতরাং পীর ছাহেব হইতে কারামৎ প্রকাশ পাওয়া খুবই সম্ভব। অনেকেই এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি নিজেকে গোপন করিবার জন্য মাদ্রাছাকে সম্মুখে একটি প্রাচীর স্বরূপ রাখিয়া দিতেন যেন লোক তাঁহার কারামৎ সম্বন্ধে টের না পায়। অবশ্য পীর ছাহেবের উঁচু দরজার খলিফা এবং বিশিষ্ট মোতাকেদগণের অনেকেরই এরূপ বিশ্বাসতো ছিলই, সে প্রমাণ দেওয়ার চেয়ে একটি হিন্দু কিভাবে এই বিষয়টি ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি।

পীর ছাহেবের প্রতিবেশী এবং মনিব এক হিন্দু ভদ্রলোক পীর ছাহেবকে বড়ো মান্য করিতেন। পীর ছাহেবের প্রতি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ভক্ত মুরীদের চেয়ে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস কম ছিল না। তিনি বয়সে পীর ছাহেবের সমকক্ষ, সম্পর্কে মনীব এবং জাতিতে হিন্দু হওয়া সত্বেও পীর ছাহেবের নিকট একটি অবোধ বালকের ন্যায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকতেন। পীর ছাহেব বসিতে বলিলে তবে বসিতেন। যে কোনও বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখে, নিজেরই হউক বা নিজ পরিবারে কাহারও হউক, পীর ছাহেবের নিকট আসিয়া অতি কাতরভাবে জানাইতেন এবং 'আশীর্ব্বাদ' প্রার্থনা করিতেন। পীর ছাহেবও তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করিতেন না। সাধ্যমত এবং শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকিয়া যাহা সম্ভব—দোওয়া তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি করিয়া দিতেন।

উক্ত ভদ্রলোকের এক ছেলে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িত। ছেলেটির জন্য ভদ্রলোকের প্রচুর টাকা ব্যয় করিতে হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ পরীক্ষায় ছেলেটি অকৃতকার্য্য হইল। ছেলের অকৃতকার্য্যতার সংবাদে ভদ্রলোক বসিয়া পড়িলেন। অগত্যা মরিয়া হইয়া ভদ্রলোক ছেলেকে আরও এক বৎসর চালাইয়া নিলেন। পুনঃ বার্ষিক পরীক্ষা সমাগত হইল। এবার তিনি পীর ছাহেবের একটু আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার মনস্থ করিলেন। মনে এই উদ্দেশ্য নিয়া উক্ত ভদ্রলোকটি ক্রমাগত কয়েকদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আসিয়া একটু

কথা বলিবার জন্য পীর ছাহেবের খানকাহের বারান্দার সম্মুখে বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। ভদ্রলোক পীর ছাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ২১ টি গোলাব-ফুল নিয়া আসিতেন এবং উহা ওজুর চৌকির উপর রাখিয়া দিতেন। কিন্তু পীর ছাহেব এই ফুল দেখিয়া মোটেই প্রীত হইতেন না। কারণ, ইহা একেতো হিন্দুদের পূজার একটি বিশিষ্ট উপকরণ, দ্বিতীয়তঃ ইহা একজন হিন্দুকর্তৃক তাঁহারই এক পরম ভক্তিভাজনকে নিবেদন করা হইতেছে, না জানি হিন্দু ব্যক্তির আকিদা কি হইবে তাহার ঠিক নাই। সুতরাং ফুল দেখিয়া পীর ছাহেব মনে মনে শঙ্কিত হইতেন। কিন্তু বলিতেন না কিছুই, হিন্দু ভদ্রলোকও তেমন কোনও কোফরী এতেকাদ প্রকাশ করিতেন না, কাজেই পীর ছাহেব মনে খুব প্রসন্ন না হইলেও কিছুই বলিতেন না। ভদ্রলোক প্রায়ই এরূপ আসেন এবং বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। কখনও ২১টি গোলাপ ফুল সামনে রাখিয়া দেন। পীর ছাহেবের সেই ফজরের ওয়াক্তে কতো কাজ ! ফজরের ওজু নামাজ, অজিফা, এই সময় কথা বলিবার অবসর থাকিত কোথায় ? কাজেই পীর ছাহেব তাহাকে 'অন্য কোনও সময়' আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ভদ্রলোক এই 'অন্য সময়ের' ব্যাখ্যা নিজ মনে মনে করিয়া ঠিক করিলেন যে, নির্জ্জন সময়েই তাহাকে দেখা করিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভদ্রলোকটি একদিন রাত্রে খুব সকাল সকাল শয্যা-গ্রহণ করিলেন। বেশ কিছু রাত্রি থাকিতে জাগিয়া উঠিয়া পীর ছাহেবের খান্‌কার বারান্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পীর ছাহেব তখন তাহাজ্জুদ নামাজের ওজু করিতে ছিলেন। ভদ্রলোক অতি বিনীতভাবে পীর ছাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেদিন পীর ছাহেব তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "হুজুর ! ছেলেটি গত পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। এইবার যদি পাশ না করে তবে ছেলের জীবন বৃথা, আমিও নিরুপায়। আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। আপনি একটু 'আশীর্ব্বাদ' করুন। পীর ছাহেব তাঁহাকে আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া 'নিশ্চিত' থাকিতে বলিলেন। পীর ছাহেবের এতটুকু আশ্বাস বাণীতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তিনি 'আশীর্ব্বাদ' করিয়াছেন।"

নিশ্চিত সফলতার আশ্বাস লইয়া উক্ত ব্যক্তি কয়েকপদ অগ্রসর হইলে পীর ছাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার মাদ্রাছায় পঁচিশটি টাকা আল্লাহর নামে মান্নত করিয়া রাখুন।"

ভদ্রলোক পীর ছাহেবের নির্দ্দেশ মতো টাকা তো মান্নত করিলেনই, অধিকন্তু ইহাও মান্নত করিলেন যে, পরীক্ষার সংবাদ শুনার পর এই টাকা পরিশোধ না করিয়া তিনি 'জল' পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না।

একদিন সত্যই পুত্রের পাশের সংবাদ-সহ টেলীগ্রাম আসিল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি টাকার যোগাড়ে বাহির হইয়া পড়িলেন। টাকা সংগ্রহ করিয়া পীর ছাহেবের নিকট পৌছিতে তাঁহার

প্রায় বেলা বারটা বাজিয়া গেল। ভদ্রলোক সে পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসী। তিনি টাকা নিয়া আসিয়া পীর ছাহেবকে সু-সংবাদ দিলেন। পীর ছাহেবের ইঙ্গিত মতো মাদ্রাছার ক্যাশিয়ার অফিসে টাকা জমা দিতে যাইয়া ভদ্রলোক এই ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন এবং তাহার সফলতার রহস্য বলিতে যাইয়া মন্তব্য করেন যে,—"ব্যাপার কি জানেন! আসলে 'আশীর্ব্বাদ' তো পীর ছাহেবই করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদেই যাহা কিছু হইবার হইয়াছে। মাদ্রাছাহ্ তো একটি ছায়া মাত্র। পীর ছাহেব আত্ম-গোপন করিবার জন্যই মাদ্রাছার আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকেন।"

অবশ্য অলি আল্লাহগণের কারামৎ সত্য, উহা তাঁহাদের অনিচ্ছা-স্বত্বেও প্রকাশ হইয়া পড়ে। উহা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদের নিজেদের ভিতর দিয়া, কখনও বা অন্য কোনও জিনিসের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। মাদ্রাছাহ্ একটি দীনি প্রতিষ্ঠান। পীর ছাহেব উহাকে আল্লাহর দীন প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং উহার ভিতরেও আল্লাহ রহমত ও কারামত রাখিয়া দিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মোট কথা, মাদ্রাছাহ্ ইহার উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ফলে মানুষের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই সকল ঘটনা দ্বারা ইহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পীর ছাহেব কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলিতেন এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন—"বাবা! আমার ন্যায় মানুষের কাজ নহে

এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং ইহার ভার বহন করা। আমার কি আছে, জমিদারী না তালুকদারী! আমি সর্ব্বতোভাবে আল্লাহর হাতে এই মাদ্রাছাহ এবং যত কিছু দেখ সব ছোপর্দ্দ করিয়াছি; কবে জান? একদিন নদীতে বোটে চলিয়াছি; নদীতে একস্থানে একটি বিরাট চর জাগিয়াছে। গভীর নদীতে সেই বিরাট চরটি দেখিবার জন্য খিরকি দিয়া তাকাইলাম। দেখি, সেই গভীর নদীর মাঝে বিরাট এক চর জাগিয়াছে। দেখিয়া আমার দুই চোখে পানি আসিল। আমি সেই দিন আমার এই মাদ্রাছাহ এবং সব কিছু খোদার হাতে ভাল করিয়া ছোপর্দ্দ করিলাম—বলিলাম খোদা! তুমি এই গভীর নদীতে কতবড়ো চর নির্ম্মাণ করিয়াছ। তোমার কুদরৎ কতো অসীম। তুমি তোমার কুদরতে আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাছাহ চালাও। সেইদিন হইতে আমি মাদ্রাছাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তবে আমার দায়ীত্ব পালন করিব।"

আল্লাহর উপর কতো গভীর তাওয়াক্কোল থাকিলে এইরূপ নির্ভরতা আসিতে পারে সাধারণ মানুষ তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ। উচ্চ শ্রেণীর অলিগণের মধ্যেই কেবল এইরূপ তাওয়াক্কোল দেখিতে পাওয়া যায়।

মাদ্রাছাহ ও বিভিন্ন তহবিলের আমানত ও হিসাব রক্ষা

অনাচার ও খেয়ানৎ যে কোন কাজের বুনিয়াদকে ধ্বংস করে। আমাদের সমাজে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছে কিন্তু আমানতে খেয়ানৎ ও অনাচারের জন্যই উহা আবার সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপব্যয় এবং আমানতে খেয়ানৎ উভয়ই হারাম। পীর ছাহেব এই দুইটি বিষয়ের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন। মাদ্রাছাহ, বোর্ডিং এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে জনসাধারণ চাঁদা স্বরূপ যে টাকা পয়সা দিতেন, উহার রক্ষণাবেক্ষণ, আমানৎদারী এবং প্রতিটি পয়সার সদ্ব্যয়ের প্রতি পীর ছাহেবের অতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সুতরাং বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি মাদ্রাছাহ সংক্রান্ত যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

খুলনা জিলার রায়েন্দার অধিবাসী মরহুম মওলবী ছুফী ইয়াছীন ছাহেব পীর ছাহেবের প্রথম হিসাবরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পীর ছাহেবের জীবনের প্রথমাবস্থার সহচর ও মুরীদ ছিলেন। তিনি পীর ছাহেবের সঙ্গে ছফরে যাইতেন এবং মোহরীর কাজ করিতেন। তিনি সরল, আবেদ, মোত্তাকী ও দরবেশ স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি শিক্ষিত তেমন বেশী ছিলেন না, কিন্তু পীর ছাহেবের ছোহবতের গুণে পাকা দীনদার হইয়াছিলেন। কাজেই কেশিয়ার হিসাবে তিনি খুবই নির্ভরযোগ্য পাত্র ছিলেন। হিসাবে পাকা, ত্যাগী, পরিশ্রমী এবং অনুগত ছিলেন। তিনি

সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল এই প্রতিষ্ঠানের কেশিয়ার ছিলেন। সহস্র সহস্র টাকা পাহারা দিতেন কিন্তু তিনি জীবনে একটি পয়সা এদিক সেদিক করেন নাই। তিনি সহস্র সহস্র টাকার একটি নির্ভরযোগ্য লৌহ সিন্দুক স্বরূপ ছিলেন। ইহাই তাক্ওয়ার মূল্য! পীর ছাহেবের আদর্শে তাঁহারা গঠিত হইতেন। তিনি আজ বাঁচিয়া নাই। আল্লাহ তাঁহার রুহকে নাজাত দান করুন।

এই লোকটির দ্বারা পীর ছাহেবের হিসাবের বিভাগ পত্তন হয়। অতঃপর আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়। মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেবের তত্ত্বাবধানে ও সু-পরিচালনাগুণে এই বিভাগ ক্রমশঃ সুষ্ঠু ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং উহার প্রধান দায়ীত্ব তাঁহার উপরেই অর্পিত হয়। মাদ্রাছার চাঁদা এবং অন্যান্য যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং তহবিল রক্ষার দায়ীত্ব এই বিভাগ কর্তৃক বহন করা হয়। নির্ভরযোগ্য লোকের হাতে দায়ীত্ব ছোপর্দ্দ করিলেও পীর ছাহেব সর্ব্বদা হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে সজাগ থাকিতেন। তিনি প্রায়ই হিসাব দেখিতে চাহিতেন এবং তদারক করিতেন। কোথাও অধিক, অনাবশ্যক কিংবা অতিরিক্ত ব্যয় দেখিলে তিনি তখনই সাবধান করিতেন এবং সম্ভব হইলে ছাটাই করিয়া দিতেন। তিনি একটি একটি পয়সার অপচয়ের জন্য অস্থির হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, "মাদ্রাছার তহবিলের টাকা আমার শোণিতের ন্যায়।" তিনি সামান্যতম ব্যাপারেও মাদ্রাছার উপর নির্ভর

করিতেন না এবং সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। এমন কি অজস্র লোক মাদ্রাছার চাঁদা দিতেন, কিন্তু পীর ছাহেব মাদ্রাছার টাকা নিজ হাতে লইতেন না। কেহ নিকটে থাকিলে তাহাকে গ্রহণ করিতে বলিতেন, অথবা যিনি দিতে আসিতেন, তাঁহাকে কেশিয়ারখানায় কিংবা মাদ্রাছার চাঁদার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাক্সে তাঁহার নিজ হাতেই রাখিয়া দিতে বলিতেন। কেহ হঠাৎ মাদ্রাছার টাকা হাতে দিয়া বসিলে কিংবা কেহ পীর ছাহেবের হাতে দিয়া 'বরকত' লাভ করার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তিনি গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তৎমুহূর্ত্তেই আবার উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। মাদ্রাছার আমানৎ সম্পর্কে তিনি সর্ব্বদাই এরূপ সতর্ক থাকিতেন। কেন এরূপ করিতেন? ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ ধারণা না করে যে, পীর ছাহেব হয়তো মাদ্রাছার চাঁদাও নিজ পকেটেই রাখেন এবং প্রয়োজন মতো নিজে ব্যয় করেন, এরূপ মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ গুণাহে পতিত না হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি উহা দ্বারা প্রত্যেক সমাজকর্ম্মীর জন্য এই আদর্শই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে, সমাজের কাজের জন্য অপরের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে উহার প্রতি কিরূপ সতর্ক ও নির্লোভ থাকিতে হয়। বস্তুতঃ চাঁদার টাকার স্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়াই যে কেবল তিনি ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা নহে, বরং জীবনে অজস্র কাজের ভিতর দিয়া সকলের সম্মুখে তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জীবন কাহিনীতে ক্রমান্বয়ে সেই সব কথা আসিতে থাকিবে। এখানে পাঠকগণকে ২।১টি দৃষ্টান্ত পেশ করি।

একদিন পীর ছাহেবের নিজস্ব লঙ্গরখানার বাবুরচি লঙ্গর-খানার ডেক্‌চি পরিষ্কার করিবার জন্য মাদ্রাছাহ্ প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে রক্ষিত স্তুপাকার বালুকারাশি হইতে সামান্য পরিমাণ বালুকা আনিতেছিলেন। পীর ছাহেব অদূরেই কোথাও ছিলেন। ইহা কেমন করিয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বালি কোথায় কি কাজে নেওয়া হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পীর ছাহেবের নিজস্ব কাজের জন্যই উহা নেওয়া হইতেছে। তিনি মাষ্টার এমদাদ আলী ছাহেবকে তৎক্ষণাৎ ডাকিলেন এবং উক্ত মুষ্টি প্রমাণ বালুকার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। মাষ্টার ছাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হুজুর! এই সামান্য বালুকার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না, হুজুর ইহার মূল্য দিতে চাহিলে মাদ্রাছাহ্ তহবিলে দুটি পয়সা দিয়া দিতে মরজি করুন।" পীর ছাহেব তখনই নিজ পকেট হইতে দুইটি পয়সা দিয়া বালুকার মূল্য শোধ করিলেন।

পীর ছাহেব মাদ্রাছার যে কোনও জিনিস হইতে উপকার গ্রহণ করা সম্বন্ধে এরূপ সাবধান থাকিতেন যে, ইহার তুলনা মিলে না। তিনি মাদ্রাছার দেওয়ালে হাত দিয়া তৈয়ম্মম পর্য্যন্ত করিতেন না। তিনি কথা প্রসঙ্গে কয়েকদিনই ইহা আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, "মাদ্রাছার গায়ে হাত দিয়া তৈয়ম্মম করিতেও আমার ভয় হয়; কারণ, ইহাতে অপরের অর্থ রহিয়াছে।"

মাদ্রাছার প্রতি পীর ছাহেবের আমানৎদারী ছিল এই জাতীয়; সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলেই পীর ছাহেবের অনুকরণে মাদ্রাছাহকে একটি পবিত্র আমানৎ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই আমানতদারী এবং প্রত্যেকটি কর্ম্মীর ত্যাগ ও অনাড়ম্বর জীবন। শরীয়তের পাবন্দী এবং তাক্ওয়া কেবল মানুষের আখেরাতে বেহেশত লাভ করিবার জন্যই প্রয়োজন নহে, বরং দুনিয়ার কাজ-কর্ম্ম পরিচালন এবং দায়িত্ব বহনের ব্যাপারেও উহার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; পীর ছাহেব এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ভিতর দিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশবাসীর সামান্য সামান্য দান সঞ্চয় করিয়া এই বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত না—যদি না ইহার প্রতিটি পাইকে একটি পবিত্র আমানৎ বলিয়া মনে করা হইত। আমানতে খেয়ানৎ, অপব্যয়, অমিতব্যয় এবং বিলাসিতা যে হারাম, এই শিক্ষায় পীর ছাহেব তাঁহার কর্ম্মীগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সামান্য চাঁদার আয় দ্বারা দেশবাসীর জন্য এই বিরাট প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। দেশ, সমাজ এবং রাষ্ট্র পীর ছাহেবের এই আদর্শ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিলে বিশেষ লাভবান হইবেন।

বার্ষিক মাহ্ফিল প্রতিষ্ঠা

পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) এর সারাটি জীবন ছিল দীনী কাজের একটি উৎস। তিনি বহুবিধ কাজ একসঙ্গে চালাইয়া যাইতেন। নিঃসম্বল জীবনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা না করিয়া তিনি দেশে ইছলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং শর্ষিনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাছার ন্যায় একটি অদ্বিতীয় ইছলামী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতো ছিল বালক ও যুবকদের বিদ্যালয়। এই মাদ্রাছায় তো আর বয়স্ক সংসারী লোকেরা পড়িতে আসিবে না—আসা সম্ভব নহে। সুতরাং তাহাদের কি হইবে? আল্লাহের হুকুম আহকাম শিক্ষা করিতে না পারিলে তাহারা চিরজীবন গোমরাহীর মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে এবং পরকালে, আল্লাহর আজাবে গেরেফ্‌তার হইবে। বিশেষ করিয়া তিনি নিজ মুরীদগণের কথাই চিন্তা করিলেন। কেননা আল্লাহ পাক বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের অনুবর্ত্তীগণকে (দোজখের) আগুন হইতে বাঁচাও।"

আল্লাহর এই আদেশ দ্বারা যেমন নিজকে আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য তাকিদ করা হইয়াছে, তেমনই তাকিদ করা হইয়াছে নিজ অনুবর্ত্তীগণকে বাঁচাইবার জন্য। পীর ছাহেব কেব্‌লা আল্লাহর

এই আদেশের জন্য শঙ্কিত হইলেন এবং দেশের অজ্ঞ জনসাধারণ এবং নিজ তাবেদার মুরীদ ও মোতাকেদগণকে আল্লাহর ফরমান শিক্ষা দিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই মহান উদ্দেশ্য নিয়াই তিনি নিজ বাড়ীতে একটি বার্ষিক দীনি জল্ছার অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন।

মাদ্রাছাহ্ প্রতিষ্ঠার সম-সময়ে কি তারও দু'এক বৎসর পূর্ব্বেই এই জল্ছার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

মাদ্রাছাহ্ যেমন গোলপাতার গৃহে আরম্ভ করা হইয়াছিল, এই মাহ্ফিলও তেমনি তিনি নিজ তওফিক অনুসারে ক্ষুদ্রাকারেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে মাদ্রাছার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী-ঘরের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এই জল্ছা যখন প্রথম আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বাড়ী-ঘরও একটি সভা-সমিতির পক্ষে উপযোগী ছিল না। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য ছিল নেক এবং অনাড়ম্বর সরলতা ও দীনের তাবলীগ ও তালীম ইহার অঙ্গীভূত হওয়ায় এই জল্ছা প্রতি বৎসরই উন্নত হইতে উন্নতর হইতে লাগিল। প্রথম বৎসরে মাত্র কয়েক শত লোক এই মাহ্ফিলে যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত লোকগণকে দীনি ওয়াজ নছিহত শুনান হইল। কিছু কিছু আলেমও এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে লোকদিগকে আল্লাহ ও রছুলের বাণী শুনাইলেন। জলছাটি আগাগোড়া ইছলামী উদ্দেশ্যে এবং দীনি চর্চ্চার ভিতর দিয়া সম্পন্ন হওয়ায় বড়ই শান্তিপ্রদ হইয়াছিল। পীর ছাহেব নিজ

ব্যয়ে উপস্থিত লোকগণকে সাধারণভাবে খানা-পিনা পরিবেশন করিলেন। পরিশেষে এই সকল কার্য্যের ছওয়াব পয়গম্বর, আছহাব, অলি আওলিয়া, শহীদান এবং সাধারণ মোমেনগণের রুহের কল্যাণার্থে পীর ছাহেব বখ্শেশ করিয়া দিলেন।

এই ভাবে প্রথম জলছাটি সম্পন্ন হইল। অতঃপর ইহা প্রতি বৎসর একই উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট তারিখে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের ১৪।১৫ এবং ১৬ই তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সুদীর্ঘ আটত্রিশ কি উনচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই জলছা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসরই লোক সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার আয়োজন বিরাট এবং ইহার কার্য্যকারিতার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে সমাজে ইছলামী আদর্শ ও শিক্ষা-বিস্তারে ইহা বর্ণনাতীত কাজ করিয়া আসিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোন বৎসরই এই জলছা বাদ পড়ে নাই এবং কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই, বরং প্রতি বৎসরই ইহার ক্রম-বর্দ্ধমান জন-সমাবেশ ও আয়োজনের সৌষ্ঠব দর্শকবৃন্দকে মোহিত ও বিস্ময়াপ্লুত করিয়াছে।

আমরা পাঠকগণকে এই অনুষ্ঠানের পরিণত রূপের একটি আভাস দিতেছি।

আয়োজন

প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে এই জলছার আয়োজন শুরু হইয়া যায়। উপস্থিত লোকগণের খানা পাকাইবার জন্য সহস্র

সহস্র মণ সুন্দরী কাঠ চেড়াই হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। মাহফিলে অনুমান এক লক্ষ লোক সমাগম হয়। সভার প্রোগ্রাম তিন দিন পর্য্যন্ত চলে। কাজেই তাহাদের জন্য সাধারণভাবে খাদ্য পরিবেশন করিতে হইলেও ব্যাপার কিছু অলৌকিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। স্তূপিকৃত চাউল, ডাইল, তরি-তরকারী যথাসময়ে খরিদ করিয়া সঞ্চিত করিতে হয়! গরুর গোশতই ব্যবহার হয়। সুতরাং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গরুও পূর্ব্বাহ্নেই খরিদ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নূন, তৈল ও অন্যান্য মসল্লাদির প্রয়োজনও কেবল সাধারণ মনে করা চলে না; সুতরাং উহারও বিধি ব্যবস্থা যথাসময়েই করিতে হয়। তারপর ইহা পাকাইবার হাড়ি, পাতিল, ডেকচি ও বর্ত্তনাদি আবশ্যক পরিমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। প্রথম দিকে অবশ্য এই সকল জিনিসের জন্য বাহিরের সাহায্য দরকার হইত। বর্ত্তমানে আল্লাহর রহমতে এই সকল আছবাবের জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। পীর ছাহেব প্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিসই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মাহফিলের খেদমতগার ও স্বেচ্ছাসেবকগণ

মাহফিলের আয়োজনে পীর ছাহেবের বিশিষ্ট খলিফা ও মুরীদগণ বর্ণনাতীত খেদমত করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ নিজ এলাকা হইতে দীনদার, নামাজী ও ছুন্নৎ তরিকার পাবন্দ লোকগণকে এই মাহফিলের খেদমতের জন্য প্রেরণ করিয়া

থাকেন। কখনও বা এই সকল খলিফাগণ নিজেরাই সঙ্গে থাকিয়া মাহফিলের কাজ আঞ্জাম দিয়া থাকেন। এই সকল খলিফাগণের মধ্যে পীর ছাহেবের বিশিষ্ট খলিফা, পটুয়াখালী মহকুমার পাঙ্গাসিয়া নেছারিয়া ইছলামিয়া ছিনিয়ার মাদ্রাছাঁর প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম ছাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য আরও বহু স্থান হইতে এই বিরাট অনুষ্ঠানে লিল্লাহ খেদমতগারগণ আসিয়া শরীক হইয়া থাকেন। মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে মাহফিলের আয়োজন জনিত কাজের আর অন্ত থাকে না। অভাবিত ও অকল্পিতভাবে পূর্ণ শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া এই আয়োজন অগ্রসর হইতে থাকে। কুড়ি পঁচিশটি স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী অবিরত কাজ করিয়া যাইতে থাকেন। কোথাও নূতন পুষ্করিণী কাটা হইতে থাকে, কোথাও বা কাটা পুষ্করিণী ভরাট করা হয়, কোথাও অগভীর খাল কাটিয়া গভীর করা হয়, কোথাও মেহমানদের জন্য অস্থায়ী পায়খানা, প্রস্রাবখানা তৈয়ার, কোথাও ঘাট দেওয়া, কোথাও জেটি তৈয়ার করা, পথ-ঘাট সংস্কার করা, লোকের চাপ সামলাইবার জন্য কোথাও বেড়া দেওয়া, মেহমানদের ব্যবহারের জন্য কুলুখ তৈরী করিয়া শুকান, মাহফিল প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটাইবার জন্য বিরাট বাঁশের মাচান তৈরী করা, সামিয়ানা তৈয়ার, সংগ্রহ ও মেরামত, হাড়ি-পাতিল, ডেকচি মাজাঘসা, শুকানো, খাদেমগণের থাকিবার অস্থায়ী ঘর তৈয়ার, বড়ো বড়ো মটকিতে পানের পানি সঞ্চয়,

বাড়ী-ঘর, রাস্তা, পুষ্করিণী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি অজস্র প্রকারের কাজ শত শত হাতে চলিতে থাকে। বিভিন্ন গ্রুপে প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ চলে। প্রত্যেক গ্রুপের এক একজন প্রধান পরিচালক থাকে। বৈঠক করিয়া এই সকল কর্মীদের গ্রুপ বাছাই করিয়া কাজের লিস্ট দিয়া দেওয়া হয়। বৈঠকগুলি পীর ছাহেব কেবলার জীবদ্দশায় তাঁহার সম্মুখেই বসিত। এই সব বৈঠকে পীর ছাহেবের প্রধান পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়া দিতেন। বর্ত্তমানে পীর ছাহেব কেবলার বড়ো ছাহেবজাদা গদীনশীন হিসাবে এবং মধ্যম ছাহেবজাদা তাঁহার সহকারী হিসাবে এই সব ব্যবস্থার দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। দরবারের পুরাতন ও নূতন সকল কর্মীই তাঁহাদের স্ব-স্ব স্থানে বহাল থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই সকল দায়ীত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। মোটের উপর একটি শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া স্রোতের বেগে আয়োজনের কাজ চলিতে থাকে।

প্যাণ্ডাল :—মাদ্রাছাহ্, মছজিদ ও মোছাফেরখানা বেষ্টিত বিরাট প্রাঙ্গণেই সভার প্যাণ্ডাল নির্ম্মিত হয়। সমগ্র প্যাণ্ডালটি বাঁশের মাচানের উপর একরঙ্গা সামিয়ানা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। নীচে মোটা পাতার বিছানা এবং প্রধান মঞ্চোপরি অভ্যাগত আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বসিবার জন্য সতরঞ্চী ও ফরাশ বিছান হয়। প্রথমে মঞ্চ অস্থায়ীভাবে তৈয়ার করা হইত। কয়েক বৎসর হইল উহা স্থায়ীভাবে পাকা করা হইয়াছে। মঞ্চের উপরিভাগে রঙ্গীন শালুর সুদৃশ্য ঝালর বিশিষ্ট চাঁদোয়া

দ্বারা সু-শোভিত করা হয়। মঞ্চের চারিপাশের খাম্বাগুলি লাল-সাদা কাপড়ে মোড়া হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্যাণ্ডাল :—বিগত কয়েক বৎসর যাবত সভার জন্য বোর্ডিং দালানের সম্মুখ ভাগের মাঠে আর একটি পৃথক প্যাণ্ডাল নির্ম্মিত হয়। এখানেও বাঁশের মাচানের উপর সামিয়ানা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এখানে ছোট-খাট অনুষ্ঠানগুলির অধিবেশন চলিতে থাকে।

তৃতীয় প্যাণ্ডাল :—এই প্যাণ্ডালে মেহমানদিগকে খাওয়ান-খেলান হয়। বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া বাঁশের মাচানের উপর সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া সমগ্র স্থানটি সুন্দররূপে ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

চতুর্থ প্যাণ্ডাল :—পীর ছাহেবের খানকাহ্ শরীফের সম্মুখ ভাগে জেকের ও মোরাকাবার জন্য এই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ওলামায়ে-কেরাম, বিশিষ্ট অতিথি এবং বিভিন্ন কর্ম্মী ও কর্ম্ম পরিচালকদের জন্য ভিন্নস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। মাহফিলের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই কর্ম্ম-চাঞ্চল্য বাড়িতে থাকে। এই সময় বোর্ডিং-এ অবস্থিত সমুদয় ছাত্র এবং মোদার্রেছিন সকলেই সমবেতভাবে মাহফিলের আয়োজনে অবতীর্ণ হন। বোর্ডিং দালান সমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, মাহ্ফিলের সময় স্বেচ্ছাসেবক রূপে কাজ করার জন্য কর্ম্ম-সূচী তৈয়ার করা, ছাত্রদের নিজস্ব অনুষ্ঠান সমূহের অফিস ও প্যাণ্ডাল নির্ম্মাণ, সভার নীতি-জ্ঞাপক পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন লিখা,

মাহফিলে আবৃত্তির জন্য বক্তৃতা, কবিতা, কেরাৎ-গজল ও নাতিয়া ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে। এ ছাড়া মাদ্রাছার ছাত্র প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন, বার্ষিক রিপোর্ট লেখা, অনুমোদন, মুদ্রন ইত্যাদি নানাবিধ কাজে ছাত্রগণ এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে প্রাণপণ সহযোগিতা করিয়া থাকেন। এই জলছা উপলক্ষে প্রায় প্রতি বৎসরই এক বা একাধিক দেশ-বরেণ্য নেতা, মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিভিন্ন ভাষায় মান-পত্রাদি দেওয়া ও বিভিন্ন আয়োজনও করা হইয়া থাকে।

মোট কথা, এই বিপুল পরিমাণ মেহমানদের প্রত্যহ দুইবার খাওয়া, বসা, শোওয়া, মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা, অজু-গোছল, পানীয় পানি, নামাজের জমাত ও প্রধানতঃ ওয়াজ নছিহত শুনিবার আয়োজনে প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্বে সমগ্র এলাকাটি নিরলস কর্ম্ম-চঞ্চলতায় অভূত-পূর্ব্বভাবে মুখরিত হইয়া উঠে। এ-যেন একটি যন্ত্র, একটি স্রোত, একটি প্রবাহ আপন প্রাণ চঞ্চলতায় আপন দায়ীত্বে বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও সংঘাত নাই, কোথাও উচ্চ-বাচ্য নাই, কটু-কর্কশতা নাই, হাসি-ঠাট্টা নাই, জোর-জবরদস্তী নাই, আবার প্রাণের অপ্রাচুর্য্যও নাই। প্রশান্ত, সংযত, উৎফুল্ল, সজীব, নিঃস্বার্থ নিরলস এই কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে বিশাল উদার্য্য-মণ্ডিত দীপ্ত-গম্ভীর একটি মানুষ, একটি জ্যোতি স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কি মনোরম সে দৃশ্য! কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন নহে; শান্ত-সরল প্রফুল্লতায় সকলেরই প্রাণ ভরিয়া

দিতেছেন; বিশাল আকাশে যেন পূর্ণিমার জ্যোছনা পরিব্যাপ্ত; সকলেরই সঙ্গে অথচ যেন কোটি যোজন দূরে অবস্থিত। এই আয়োজনের কোলাহলের মধ্যে জলছার তারিখ উপস্থিত হয়।

লোক সমাগম

অগ্রহায়ণ মাসের ১২ই তারিখ হইতে সভায় লোক সমাগম হইতে থাকে। ১৩ই তারিখ বেশ কিছু লোক জমিয়া যায়। দিবা-রাত্রি নৌকায়, ষ্টীমারে জন-স্রোত আসিতে থাকে। এই দিন বাদ-মাগরেব মাহফিলের উদ্বোধন করা হয়। বাংলার প্রতি জিলা এমন কি আসাম হইতে এই জলছায় লোক শরীক হইয়া থাকে। আলেম-ওলামা, মোত্তাকী, পরহেজগার, নিরক্ষর জনসাধারণ এবং উচ্চ-মধ্য-নিম্ন নানা শ্রেণীর শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই জলছায় যোগদান করিয়া থাকেন।

১৪ই অগ্রহায়ণ সমগ্র প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নির্দ্দিষ্ট তারিখ অনুসারে ইহাই সভার প্রথম দিন। সারাদিন ব্যাপী ওয়াজ-নছিহত চলিতে থাকে। পীর ছাহেব কেব্‌লা জীবিত থাকিতে তিনিই মাহ্‌ফিল উদ্বোধন করিতেন। তিনি লোকদিগকে চোর-বদমাশ ও পকেটমার হইতে প্রথম হইতেই সাবধান করিতেন এবং এই বিরাট জনতার মাহ্‌ফিলে স্বভাবতঃই খাওয়া ও শোওয়ার নানাবিধ অসুবিধা জনিত কষ্টের জন্য পূর্ব্বাহ্লেই সকলের নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইতেন। এই মাহ্‌ফিলের ভিতরে কেহ শরীয়তের খেলাফ কোনও প্রকার আচরণ না করে

তজ্জন্য তিনি বিশেষ অনুরোধ করিতেন। এইভাবে প্রতি বৎসর বিশেষভাবে তাকিদ করার ফলে উক্ত মাহ্ফিল সর্ব্ব প্রকার শরীয়তের খেলাফ কার্য্য হইতে পাক হইয়া গিয়াছে।

১৩ই অগ্রহায়ণ মাগরিবের পর হইতেই ওয়াজ শুরু হয়। বিশিষ্ট আলেমগণ ইছলামের আদর্শ ও দীনিয়াৎ সম্পর্কে ওয়াজ করেন। ইমান, আকায়েদ, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাৎ আখলাক; আমল জেকের মোরাকাবা, মোশাহেদা, বেহেশ্‌ত, দোজখ, হালাল, হারাম এবং নেকী-বদী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা, ক্রমান্বয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সুমধুর ঝংকারে পবিত্র কোরআন পাকের আয়াত ও হাদীছ শরীফ অবলম্বনে ওয়াজ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সুদ, ঘুষ, পর্দ্দাহীনতা, ব্যভিচার, চুরি, মিথ্যাবাদীতা, গীবৎ শেকায়েৎ, দলাদলী ও শেরেক বেদাৎ ইত্যাদি শরিয়ত বিরোধী কার্য্যাবলীর পার্থিব অপকারিতা ও পরকালের শাস্তির কথাও ক্রমান্বয়ে জনে জনে বর্ণন করিয়া যাইতে থাকেন। জনতা নিস্তব্ধ হইয়া প্রাণ ভরিয়া এই ওয়াজ শুনিতে থাকে। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের প্রাণ বিগলিত হইয়া যায়। তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হন; কখনও বা হৃদয়াবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া উচ্চ-চিৎকারে হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতে থাকে। জনতা যেন হঠাৎ তাঁহাদের জীবন ফিরিয়া পায়। শত অনুশোচনা ও অনুতাপ তাঁহাদের প্রাণে জাগিয়া উঠে! জীবনের কৃত অপরাধ ও গুনাহ সমূহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহাদের যেন একটি আকুল আবেদন প্রাণের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে।

নামাজের জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়। এইজন্য প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট লোকের হাতে সময়, আজান ও একামত ইত্যাদির ভার অর্পিত থাকে। আজান হওয়া মাত্র এই বিরাট জলছার শত শত প্রকারের কর্ম্ম-কোলহল সহসা স্তব্ধ হইয়া যায়। আজানের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের দরকার তাঁহারা ওজু ও পাক-পাকিজার কাজে চলিয়া যায়। ইহার পরে সুদীর্ঘ কাতারে লোক দাঁড়াইয়া যায়। মাদ্রাছার স্বেচ্ছা-সেবকগণ দোকানদার ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে লিপ্ত লোকজনকে আহ্বান করিয়া নামাজের জমাতে শরীক করেন। কারণ, ইহা প্রথম হইতেই পীর ছাহেবের কঠোর নির্দ্দেশ ছিল যে, কোনও ব্যক্তিই যেন মাহফেলে নামাজের জমাত তরক না করে। মাঝে মাঝে এরূপ ঘটিয়া বসিলে পীর ছাহেব বজ্র-গম্ভীর নিনাদে সকলকে সাবধান করিয়া দিতেন যেন কেহই আমোদ-প্রমোদে গল্প-গুজবে ও চায়ের দোকানে কিংবা অন্য কোনও কাজে লিপ্ত থাকিয়া জমাত তরক না করে। এইভাবে তিনি এই বিরাট জলছার সকলকেই নামাজের জমাতে সামিল করিতেন এবং প্রকৃত কাজের মধ্য দিয়া নামাজ ও জমাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইয়া দিতেন। এই যত্নের ভিতর দিয়া নামাজের যে জমাত গঠিত হইত উহার সৌন্দর্য্যগত ও ভাবগত বৈশিষ্ট মানুষ মাত্রকেই বিমুগ্ধ করিয়া দিত। আজিও আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে পীর ছাহেবের এই আদর্শ ও শিক্ষা শর্ষিণার বুকে অক্ষত রহিয়াছে; উহার কণামাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

খানা-পিনা

এই যখন একদিকের দৃশ্য, তখন অন্যদিকে এক বিরাট এলেকায় সহস্র সহস্র লোকের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন চলিতে থাকে। বড়ো বড়ো টিনের নৌকায় ভাত পাকান হইতেছে, একটি বড়ো গৃহে সেই ভাত স্তূপিকৃত হইতেছে। ৪০।৫০ টি বড় বড় তামার ডেকচিতে গোশ্‌ত তরকারী ও ডাইল পাকান হইতেছে। শত শত লোক এই আয়োজনে ব্যস্ত রহিয়াছে। কর্ম্মঠ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ খলিফাগণ এই কাজের বিভিন্ন বিভাগের ভার-প্রাপ্ত হিসাবে সেই এলেকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিমায় আশ্রয় নিয়াছেন। তাঁহারা এই বিভাগের সকল বিষয়ের হিসাব নিকাশ, রক্ষনাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বহন করেন। খানা পাকান হইলে তাঁহারা সংবাদ দেন এবং যথাসময়ে লোক দিগকে খানা দেওয়া হয়। ক্রমাগত বৈঠকের পর বৈঠকে খাওয়ান হইলে থাকে। সারাদিন ও সারারাত্রি পাকান ও খাওয়া চলিতে থাকে। অপরদিকে মাহফিলের কাজও চলিতে থাকে।

১৫ই অগ্রহায়ণ। এই দিনই মাহফিলের প্রধান কার্য্যাবলী সম্পন্ন হয়। ভোর হইতে প্রায় ৯টা-১০টা পর্য্যন্তকোরান শরীফ খতম, তাছবীহ, তাহলীল ও ছুরা এখ্‌লাছ পাঠ হইতে থাকে। বহু-সংখ্যক বার কোরান শরীফ খতম ও লক্ষ লক্ষ সংখ্যক তাছবীহ, তাহলীল পাঠ হইয়া যায়। এইদিন বাদ-জোহর মীলাদ শরীফ পাঠের পর দোওয়ার অনুষ্ঠান হয়। এই দোওয়া অত্র জলছার একটি প্রধান অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানে ওয়াজ নছিহত, দোওয়া-দরূদ

কোরান খতম এবং মেহমানদিগকে খাওয়ান-খেলান দ্বারা যে ছওয়াবের আশা করা করা হয়, তাহা সকলই মৃত পয়গম্বরগণ, আছহাব, অলী, দরবেশ এবং সর্ব্ব-সাধারণ মোমেন মুছলমানগণের রূহের প্রতি বখ্‌শেশ করিয়া দেওয়া হয়। এই পুণ্য বিতরণকে আরবীতে "ইছালে-ছওয়াব" বলে। এই জন্য গোটা জলছাকে ইছালে-ছওয়াবের জলছাও বলা হইয়া থাকে।

মোনাজাত

পীর ছাহেব যখন ইছালে ছওয়াবের জন্য মোনাজাতে হাত তুলিতেন তখন এক অভিনব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিত। সমগ্র প্রাঙ্গন জুড়িয়া সহস্র সহস্র জনতা মুহূর্ত্তে নীরব হইয়া যাইতেন এবং পীর ছাহেবের সঙ্গে করুণ-প্রাণে মোনাজাতে হাত উঠাইতেন। সে এক ভাব-গম্ভীর দৃশ্য। পীর ছাহেবের পবিত্র চেহারায় যেন মুহূর্ত্তে এক পরম কমনীয় আভা ফুটিয়া উঠিত। তিনি যেন পৃথিবী ছাড়িয়া কোন এক সু-দূর ধ্যানের জগতে চলিয়া যাইতেন। মোনাজাতের সেই স্তব্ধ-মৌন মহিমার ব্যঘাত করিতে একটি গাছের পাতাও যেন নড়িতে সাহস করিত না। ছোট ছোট শিশুরা পর্য্যন্ত দুই হাত তুলিয়া সকলের মুখে এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িত। পীর ছাহেব ক্ষণে স্পষ্ট ক্ষণে অস্পষ্ট শব্দে মোনাজাতের শব্দ সমূহ উচ্চারণ করিতেন; ক্ষণে উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেন। এই মোনাজাতের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাণের আবেগ ও বেদনা সকলই প্রকাশ পাইত। তিনি মৃত রূহগণের

মুক্তির জন্য, আল্লাহ ও রছুলের ফরমাঁবরদারীর জন্য, গোমরাহী হইতে দেশের নাজাতের জন্য এবং দেশের নেতৃবৃন্দের ছেরাতুল মোস্তাকীম লাভের জন্য, এবং সকলের প্রতি আল্লাহর রহমত নাজেল হইবার জন্যই এই প্রার্থনা করিতেন। প্রাণের সকল আবেগ, সকল মিনতি, সকল অনুভূতি ঢালিয়া দিয়া তিনি দোওয়া করিতেন। মোনাজাতের ভিতরে তাঁহার দুইটি পবিত্র চক্ষু হইতে অবিরাম ধারে অশ্রু বর্ষণ হইত। জনতা ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় বিদারী চীৎকার দিয়া উঠিত। পীর ছাহেব নিজে আবেগ জনিত শব্দ হইতে সতর্কতার সহিত সংযত থাকিতেন। কচিৎ তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্ছাস ও আর্ত্তনাদ সূচক শব্দ বাহির হইয়া পড়িলে জনতার পক্ষে উহার প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ হইয়া পড়িত। কেহবা বে-হাল, বেহুশ হইয়া পড়িত। উহাদিগকে সবশে আনিতে সময়ে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। এই ভাবে মোনাজাত শেষ হইত। ইহার পর হইতে আবার নিয়মিত ভাবে ওয়াজ-নছিহত কিংবা কোনও বিশেষ অধিবেশন থাকিলে উহার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া যাইত।

ক্রমাগত মাগরেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওয়াজ চলিতে থাকে। মাগরিবের বাদ কিছুকাল অজিফা, মোরাকাবা ও জেকরের হালকা হয়। সে আর একটি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। প্রাঙ্গন ভরা সহস্র সহস্র লোক একমাত্র আল্লাহর জেকরে মশগুল। মৃদু-শব্দে আল্লাহর নামের ধ্বনি উঠিতে থাকে। যেন সমগ্র প্রাঙ্গণটিই আল্লাহর জেকরে বসিয়া গিয়াছে। গাছ-পালা, মাটি,

সামিয়ানা, আলো-বাতি ও শূন্য-মণ্ডল হইতে যেন আল্লাহর জেকরের ধ্বনি উঠিতেছে। আল্লাহ বলিয়াছেন :

"এমন কোনও পদার্থই নাই যাহা আল্লাহর গুণ-কীর্ত্তন না করে কিন্তু তোমরা উহাদের তছ্‌বীহ্ সমূহ বুঝিতেছ না।"

বস্তুত: প্রকৃতির ভিতর হইতে যে জেকর উত্থিত হয়, তাহা শ্রুত হয় না বটে, কিন্তু তরিকৎ-পন্থীদের নিকট উহা ক্ষণে স্পষ্ট হইয়া উঠে। মোরাকাবার নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয়। কাজেই প্রকৃতির ভিতর হইতে জেকরের ধ্বনি শ্রুত হওয়া নিছক কল্পনার কথা নহে—ইহা আল্লাহর কোরআন-পাক দ্বারাই প্রমাণিত রহিয়াছে এবং ইহা অবস্থা-ভেদে মানুষের গোচরিভূত হইলে উহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

মোরাকাবার পরে আবার ওয়াজ চলিতে থাকে। এইদিন প্রায় সাড়া রাত্রিই ওয়াজ হয়। সামিয়ানা দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত প্যাণ্ডালে শ্রোতৃ-বৃন্দ নিজ নিজ বিছানা প্রায় স্থায়ী ভাবেই পাতিয়া লন এবং প্রাণ ভরিয়া ওয়াজ শুনিতে থাকেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ ফজরের নামাজের বাদ অজিফা, জেকর, ও মোরাকাবার বৈঠক হয়। এই সময় বিশেষ করিয়া পীর ছাহেব তাছাওয়াফ সম্বন্ধে ওয়াজ করেন। তার পর তরিকা শিক্ষার্থী লোকগণকে তওবা, বয়াৎ, জেকর ও মোরাকাবার তালীম দেওয়া হয়। প্রথম জীবনে এই সকল কাজ পীর ছাহেবকে প্রায় একাই করিতে হইত। পরে তিনি বহু সংখ্যক খলিফা দ্বারা তালীম তওয়াজ্জেহের প্রাথমিক কাজে সাহায্য লাভ করিতেন।

এইদিন ক্রমান্বয়ে জনতা হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু এদিনও প্রোগ্রাম রীতিমতোই চলিতে থাকে। তালীম তওয়াজ্জোহের বাদ আবার ওয়াজ নছিহত আরম্ভ হয়; এবং সারাদিন প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াজ বক্তৃতা হইতে থাকে।

পরদিন ১৭ই তারিখ ফজরের বাদ নিয়মিত অজিফা ও তালীমের পরে পীর ছাহেবের খলিফাগণের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। দরবারের বিশেষ কর্ম্মী, মাদ্রাছার মোদার্‌রেছিন এবং বিদেশাগত বিশিষ্ট অতিথিগণ এই জলছায় যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানটি সমালোচনা মূলক। ইহাতে পীর ছাহেবের তালীম ও তাবলীগের যাঁরা বাহক, তাঁহাদের কার্য্য পদ্ধতি এবং কার্য্য ধারার ভিতরে বৈষম্য ও অভিযোগগুলি খোলাখুলি আলোচনা হয়। পীর ছাহেব এই অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটিতেই যোগদান করিতেন এবং বিশেষ মনোযোগের আলোচনা শ্রবণ করিতেন। তিনি অধিকাংশ সময়ে নিজ পীর কেবলার আদর্শই বর্ণনা করিতেন। পরস্পরে গভীর ভ্রাতৃ-বোধ, ঐক্য এবং ক্ষমাশীলতার বিষয়ে বিশেষ ভাবে সকলকে অনুরোধ করিতেন। এমনকি কেহ কাহারও গীবৎ শেকায়েত করিবে না এবং একে অন্যকে মাফ চাহিবার পূর্ব্বেই মাফ করিয়া দিবে এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে নছিহত করিতেন এবং সময় সময় ওয়াদা পর্য্যন্ত লইতেন।

ইহার পর আরও এক সপ্তাহ-কাল এই বিরাট জলছা সমাপ্তির জের চলিতে থাকে। প্রতিবৎসরই এইরূপ শান-শওকাতে ভিতর দিয়া এই ইছলামী জলছাটির অনুষ্ঠান হয়।

এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটি পীর ছাহেবের জীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি। ইহার মূল লক্ষ্য ইছলামী শিক্ষা-বিস্তার। শরীয়ত বিগর্হিত কোনও আচরণ এই অনুষ্ঠানে চলিতে পারে না। হাততালি বাজান, গান-বাদ্য এবং ধূমপান করা শরীয়তে না-জায়েজ এবং ইছলামী আদবের বহির্ভূত বলিয়া ইহা এই অনুষ্ঠানে কেবল নিষিদ্ধই নহে, বরং ইহা এই সভার ত্রিসীমানায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সভায় কেহ বিড়ি সিগারেট বিক্রয়ার্থে আনিতে পারে না এবং কেবল ইহাই নহে—লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয় এবং ধর্ম্মীয় পুস্তকাদি ছাড়া ব্যবসায়-মূলক অন্য কোনও প্রকার দোকান-পাট এই সভা উপলক্ষে বসিতে দেওয়া হয় না। পরন্তু জেকের মোরাকাবা, নামাজের জমাত, তালীম তওয়াজ্জোহ্ ইত্যাদি কাজগুলি সর্ব্বক্ষণ চলিতে থাকে। এই জন্যই এই অনুষ্ঠানের শোভা-সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা এরূপ মনোমুগ্ধকর এবং হৃদয়গ্রাহী হয় যে, উহা দর্শক মাত্রকেই একটি পবিত্র ভক্তিভাবে আপ্লুত করে। ইংরাজী ১৯৪৬ সনে স্থানীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ জিল্ট ডনোভ্যান এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি এই সভার শৃঙ্খলা এবং ইহার ভিতর দিয়া ইছলামী আদর্শের বিকশিত রূপ দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া পীর ছাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, "আমি জীবনে একমাত্র দিল্লীতে এরূপ একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ মুছলিম সভা দেখিয়াছিলাম, অতঃপর এরূপ শৃঙ্খলাপূর্ণ সভা আর দেখি নাই।"

এই সভার উপরে পীর ছাহেবের যে অপূর্ব্ব প্রভাব পরিলক্ষিত হইত উহার দৃষ্টান্ত বিরল।

একাধারে ইছলামী শিক্ষা সমূহের প্রচার ও আলোচনা এবং সভার ভিতর দিয়া কার্য্যকরিভাবে উহা ফুটাইয়া তোলার দিক দিয়া এই সভার গুরুত্ব সীমাহীন। পীর ছাহেব যে যুগে এই বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তখন তদীয় মোরশেদ কেব্‌লার নিজ গ্রাম ফুরফুরা শরীফ ব্যতীত বাংলার অন্য কোথাও এরূপ শিক্ষা-মূলক বার্ষিক অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। যে সময় এ-দেশে ইছলামের প্রাণ-স্পন্দন প্রায় থামিয়া গিয়াছিল সেই সময় এরূপ একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের মারফতে সমাজগত ভাবে ইছলামী আন্দোলন দ্রুতভাবে ছড়াইয়া পড়িতে কতোখানি সহায়তা করিয়াছে এবং তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুধাবন করিতে পারিবেন।

এই সভার ব্যয়-ভার সম্পূর্ণ পীর ছাহেবের নিজ ব্যক্তিগত হইলেও ইহাদ্বারা শর্ষিনা আলীয়া মাদ্রাছাহ্ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছে। মাদ্রাছাহ্ সম্পর্কে দেশবাসীর প্রতক্ষ্য জ্ঞান-লাভ এবং চাঁদা ইত্যাদি বাবদে ইহার প্রভূত আঁথিক সঙ্গতি অর্জ্জনের মূলে এই অনুষ্ঠানের অসীম দান রহিয়াছে। এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পীর ছাহেব মাদ্রাছার আয় হইতে এই অনুষ্ঠানের খাওয়ান-খেলান এবং আয়োজনে ইত্যাদির জন্য কোনও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

মাহফিলের সময় পীর ছাহেবের কাজ

মরহুম পীর ছাহেবের কর্ম্ম-ব্যস্ততা এই সময় বহুগুণ বাড়িয়া যাইত। তিনি জলছায় আগত বিশেষ ও সাধারণ সকল লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা, পরিচয়, কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা এবং তাঁহাদের থাকার স্থান ও খাওয়া-দাওয়ার বিষয় তদারক করিতেন। বিশিষ্ট মেহমানদের থাকার স্থান নিজেই তদারক করিতেন। সভার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বিষয়ের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত তাঁহার সম্মুখে হইত। তিনি নিজেই ইহা শ্রবণ করিতেন এবং অনুমোদন করিতেন। বিশিষ্ট অতিথিগণের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সর্ববসাধারণ আগন্তুকদের অসুবিধা লাঘব জনিত বিষয়ে তিনিই পরামর্শ দিতেন।

যথা-সময়ে আজান, নামাজ ও জমাতের জন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে উদগ্রীব হইতেন। তিনি লোকের হাদিয়া ইত্যাদি গ্রহণের সময় তাঁহার উপার্জ্জন হালাল কিনা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রীতিমতো আদায় করে কিনা, চেহেরা মুছলমানী আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিতেন। তিনি দলে দলে আগত লোকদিগকে তওবা করাইতেন এবং মোটামোটি করণীয় উপদেশ সমূহ দিতেন। তিনি নিজেই তরিকার তালীম দিতেন এবং সভা-মঞ্চে ওয়াজ-শ্রবণ করিতেন; আধার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়াজ নছিহত করিতেন। বিশেষ মেহমান দিগকে নিজেই আগ্ বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিতেন। দূরাগত লোকদিগের কখন খাওয়া হইয়াছে এবং থাকার স্থান হইয়াছে

কিনা তাহা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যবস্থা করিবার জন্য কাহারও উপর ভার দিতেন। ইহার ফাঁকে ফাঁকে উঠিয়া প্রত্যেক কর্ম্ম-কেন্দ্র গুলি ঘুরিয়া দেখিতেন। কোথাও আপত্তিজনক কিছু দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহার 'এছলাহ' করিতেন। চা-পানি ও খাদ্য-খাদকের দোকান পাটগুলির স্থান লইয়া দোকানদার নিজ স্বার্থ-রক্ষার জন্য বিবাদে রত না হয় এই জন্য তিনি দোকান-দারদের তালিকা পূর্ব্বেই গ্রহণ করিতেন এবং তালিকার ক্রমানুক্রমিক' হিসাবে দোকান বণ্টন করিয়া চিহ্নিত করিতেন। পীর ছাহেব এই কাজটি প্রায়ই নিজ তত্ত্বাবধানে করিতেন। তথাপী এইসব নিয়া একটু আধটুক গোলমাল হইত এবং তিনি নিজেই উহার মীমাংসা করিতেন।

আলেমগণের প্রতি বিশেষ সম্মানের জন্য সবাইকে বলিয়া দিতেন এবং সেই অনুসারে সাধ্যমত তাঁদের জন্য থাকার ও খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা করাইতেন। মাঝে মাঝে তিনি আলেম গণের সঙ্গে একত্রে একই বিছানায় একই বর্ত্তনে খাইতেন। লোকগণ আপত্তি করিত, ভয়ে জড়সড় হইয়া স্থান ছাড়িয়া দিত, ভাল বিছানা দিবার জন্য খাদেমগণ তাড়া হুড়া শুরু করিতেন; কিন্তু তিনি এইসব গ্রাহ্য করিতেন না। সকলকে অভয় দিয়া নিজে সবার সঙ্গে বসিয়া খাইতেন। সভার উপসংহারে তিনি নিজেই সভায় দাঁড়াইয়া আগত মেহমানদিগকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেন এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার জন্য একান্ত জড়িত-কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৫ কি ৪৬টি অনুষ্ঠান অতিবাহিত হইয়াছে ইহার মধ্যে কোনও বছরই এই সভা বাদ যায় নাই। কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই বরং প্রতি বৎসরই ইহা ক্রম বর্দ্ধমান সৌষ্ঠব ও শালীনতার সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

এরূপ বিরাট সাফল্য-পূর্ণ দিনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনও কোনও মহলে এরূপ অভিমত পোষণ করা হয় যে, তারিখ নির্দ্ধারিত করিয়া সভা-সমিতি করা বেদাত। পীর ছাহেব এই সম্পর্কে একটি 'ফতোয়া' সঙ্কলন করিয়া ইহার 'রদ' করিয়াছেন। কাহারও প্রয়োজন হইলে পীর ছাহেব কর্তৃক প্রণীত 'ফতোয়ার ছিদ্দীকিয়ার' তৃতীয় খণ্ডে উহা দেখিয়া লইতে পারেন।

আর একটি বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান

হজরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) আরও একটি বার্ষিক জলছার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। বাংলা ১৩৩৯ সনে ইহার-বুনিয়াদ হইয়াছিল। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ২৯।২৯ তারিখে এই জলছা অনুষ্ঠিত হয়। এই জলছা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রধানতঃ লিল্লাহ বোর্ডিংএর ছাত্রদের খোরাকী সম্পর্কে। ফ্রি-বোর্ডিংএর ছাত্রদের সাম্বৎসরিক খোরাকী দরুণ ব্যয়ের আভাস আপনারা বিভিন্ন পরিদর্শকের মন্তব্য হইতে জ্ঞাত হইয়াছেন। বোর্ডিংএ অবস্থানকারী ছাত্রদের খোরাকী সংস্থানই এই অনুষ্ঠানের প্রধান কর্ম্ম-সূচী। দেশের ধর্ম্ম-প্রাণ দানশীল

মুছলমান, বিশেষ করিয়া পীর ছাহেবের সন্তান-তুল্য মুরীদ ও মোতাকেদগণের নিকট প্রতি বৎসর ছাত্রদের সাহায্যার্থে চাউল ও অন্যান্য বাবদে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্বাহ্নেই আবেদন প্রচার করা হইয়া থাকে। এই আবেদন সহস্র সহস্র দীনদার মোছলমানের প্রাণে বিপুল সাড়া জাগাইয়া তুলে। বিশেষ করিয়া পীর ছাহেবের মুরীদ ও খলিফাগণ এই কাজে বিশেষ ভাবে নামিয়া পড়েন। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে হাটিয়া দিনের পর দিন এই কার্য্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাঁহারা নিজ নিজ দায়ীত্ব নৌকা বোঝাই করিয়াপ্রচুর চাউল পীর ছাহেবের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেন। এই কাজে তাঁহাদের কোনও স্বার্থ বা আয় থাকে না। নিঃস্বার্থ ভাবে আল্লাহর কাজে সাহায্য করিলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হইবেন এবং পরকালে আল্লাহ এই নেকীর পুরস্কার স্বরূপ বেহেশ্‌ত দান করিবেন; পীর ছাহেবের নিকট তাঁহারা এই সহজ-সরল শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন এবং সেই সরল বিশ্বাসে তাঁহারা বছরের পর বছর এতাদৃশ ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অকৃত্রিম সেবার ফলে এক শত হইতে চারিশত পর্য্যন্ত ছাত্রের বার্ষিক খোরাকী সংস্থান বছরের পর বছর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য সম্বৎসরের পূর্ণ খোরাকীর সংস্থান এইভাবে না হইলেও ইহা দ্বারা যে বিপুল সাহায্য হইয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য।

সভার প্রধান উদ্দেশ্য খোরাকী সংস্থান হইলেও অগ্রহায়ণের সভা হইতে ইহার আয়োজন কিছু মাত্র কম করা হয় না। রীতিমতো ওয়াজ বক্তৃতা, তালীম, তওয়াজ্জোহ, জেকর মোরাকাবা প্রভৃতি পূর্ব্ব সভার ন্যায়ই যথা-রীতি চলিতে থাকে। মাদ্রাছার বার্ষিক প্রাইজ বিতরণী ও এই সভায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। লোক সংখ্যা অগ্রহায়ণের সভা হইতে কিঞ্চিৎ কম পরিলক্ষিত হইলেও সৌষ্ঠবে কোনই ত্রুটি করা হয় না।

এই স্থায়ী জন-সভার অনুষ্ঠানটি প্রতি বৎসর অজস্র লোককে সমবেত ভাবে আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াৎ শুনাইয়া আসিতেছে। কেবল তাহাই নহে, মুছলিম লীগের সংহতি বর্দ্ধনে, পাকিস্তানের দাবী প্রচারে, এবং ইহা পাকিস্তান অর্জ্জনে অপরিসীম খেদমত করিয়াছে। পীর ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত এই উভয় বার্ষিক অনুষ্ঠানই উদাত্ত কণ্ঠে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ মূলক নীতি ও আদর্শ লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে প্রচারে সহায়তা করিয়াছে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জনমত গঠন, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা, জাতীয় ও ধর্ম্মীয় চেতনা জাগ্রত করার কাজে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানদ্বয়ের খেদমত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সভাটি যদিও মাদ্রাছার প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তথাপী ইহার আয়োজন ও খাওয়ান-খেলানের যাবতীয় ব্যয়ভার পীর ছাহেব কেবলার নিজ তহবীল হইতেই করা হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানেও মাহফিল সমূহের ব্যয়ভার পীর ছাহেবের পক্ষ হইতে পূর্ব্বের ন্যায় যথারীতি বহন করা হইয়া থাকে।

পীর ছাহেবের পুস্তক প্রণয়ন

পীর ছাহেব মরহুম কিছু সংখ্যক কেতাব তাছনীফ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনের প্রথম ভাগেই এই চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। মাদ্রাছাহ্‌ প্রতিষ্ঠার প্রায় সম-সময়ে তিনি পুস্তক প্রণয়ন শুরু করিয়াছিলেন। সমাজের কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল এই পুস্তক প্রণয়নের কারণ।

তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে এবং অর্থ-ব্যয়ে যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন উহার সংখ্যা প্রায় চল্লিশ খানা হইবে। অশিক্ষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সমাজে যে সকল শরিয়ত বিরোধী কাজ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, প্রধানতঃ তিনি সেই সকল বিষয়ের বিরুদ্ধে ইছলামী শরাহ-শরিয়তের নির্দ্দেশ সমূহ সঙ্কলন করাইয়া প্রচার করিতেন।

সর্ব্ব প্রথমে তিনি বেদাতী ফকিরগণের বিরুদ্ধে গঞ্জেহক নামক একখানা কেতাব প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। উহা পুঁথির ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহাতে ফকিরগণের শ্রেণী বিভাগ এবং খাটি ও ভণ্ড ফকিরগণের বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহাছাড়া আরও কয়েকটি জরুরী বিষয়ে এই কেতাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই কেতাব খানা আর মুদ্রিত হয় না।

পুস্তক প্রণয়নে সর্ব্বপ্রথমে মরহুম মওলবী ইয়াছিনুদ্দিন ছাহেব এবং মৌলবী ফজলুর রহীম ওরফে মতি মিয়া ছাহেব

পীর ছাহেবের সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই কেতাবের দলীল প্রমাণ সমূহ বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে লিপিবদ্ধ করিতেন।

জনাব মতি মিয়া ছাহেবের রচনা নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। তিনি পীর ছাহেবের দরবারে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পীর ছাহেবের নির্দ্দেশ ক্রমে তিনি "সমাজ উন্নতি" নামক আর একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে সুদ খাওয়া, পর্দ্দা হীনতা, ধূম পানের অপকারিতা এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি কবিতায় লিখিত। ইহার ভাষা রসাল ও প্রাণবন্ত এবং ইহা এক সময়ে সহস্র সহস্র সংখ্যায় সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। উক্ত লেখকের সহযোগীতায় পীর ছাহেব "সমাজ দর্পন" "পীর মুরীদি" এবং আরও দু'একখানা পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। এই ভাবেই পুস্তক প্রণয়ন বিভাগের বুনিয়াদ পত্তন হয়।

ইহার কিছুকাল পরেই মওলবী এমদাদ আলী ছাহেব পীর ছাহেবের সাহচর্য্য লাভ করেন এবং ক্রমান্বয়ে পুস্তক প্রণয়নের দায়ীত্ব তাঁহার উপরে অর্পিত হয়। তিনি নিজ উদ্যম এবং কর্ম্ম-দক্ষতার দ্বারা এই বিভাগটি অল্প দিনেই একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ দান করেন। তিনি একাধারে পীর ছাহেবের নির্দ্দেশ ক্রমে পুস্তকের অনুবাদ করা, ইহাকে পুস্তকাকারে সুসংবদ্ধ করা এবং উত্তম ছাপার ব্যবস্থা, প্রচার ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই নিজ দায়ীত্বে করিতে আরম্ভ করেন। ফলে উহা পাঠক সমাজে বিশেষ আদৃত হইল এবং একটি নূতন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল।

ইহার পরে পীর ছাহেব "তরিকুল ইছলাম" নামক পুস্তক প্রণয়নে হাত দেন। ইহা একখানা বৃহৎ বাংলা ফেকাহ। "তাহারৎ" অর্থাৎ পাক-পাকিজা হইতে আরম্ভ করিয়া জানাজাহ পর্য্যন্ত নামাজ সংক্রান্ত যাবতীয় মছলা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহিখানা ক্রমান্বয়ে এগারো খণ্ডে বিভক্ত। পুস্তক খানা প্রশ্নোত্তরের ধারায় লিখিত। ইহার প্রত্যেকটি মছলায় এক বা একাধিক ফেকাহের কেতাবের 'হাওয়ালা' দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু প্রত্যেকটি মছলার মতভেদগুলি এবং হানাফী মাজহাব অনুসারে গ্রহণীয় মতগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কেতাব প্রণয়নে পীর ছাহেব সর্ব্বাধিক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করেন। ইহা বাংলা দেশে সর্ব্বজন আদৃত দিনীয়াত পুস্তক। এই পুস্তক ক্রমাগত কয়েক বৎসরে লিখা সমাপ্ত হয়। এই কেতাবের দ্বারা পাক-পাকিজা এবং নামাজ সম্বন্ধীয় মছলা সমাজে দ্রুতভাবে প্রচারিত হয়। (১)

---

(১) তরিকুল ইছলামের আলোচ্য মছলা সমূহ নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ফেকাহ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

শরহে বেকায়া, হেদায়া, শামী, আলম গীরী, কাজীখান, বাহরোর রায়েক, দোররোল মোখতার, গায়তোল আওতার, তাহতাবী, জামেউর রমুজ, মারাকিল ফালাহ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, জাওহারাতুন্ নাইয়ারা, ফতহোল কাদীর, বজ্জাজিয়া, ছগীরী, কবিরী, এনায়া, মোলতাকা, শরহে মোলতাকা তাবিয়ুল হাকায়েক, শরাম্বালালিয়া, খোলাছা, মুনিয়া, আরকানে আরবা, মালাবুদ্দাহ, খানিয়া, নূরোল ইজা ও মবছুত ইত্যাদি।

(১) **তালীমে-মারেফত**ঃ ইহা তরিকত সম্বন্ধীয় বাংলা পুস্তক। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা চারিটি প্রসিদ্ধ তরিকায় অভিজ্ঞ ছিলেন। উক্ত তরিকা চতুষ্টয় হইতেছে নকশ্ বন্দীয়ারে মোজাদ্দাদীয়া, চিশতীয়া, কাদেরীয়া এবং মোহাম্মদীয়া। তিনি এই সকল পন্থায়ই মুরীদগণকে তলকীন করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের জন্য একখানা পুস্তক প্রণয়ন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সেই কারণে তিনি এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানা তরিকতের একখানা প্রামাণ্য পুস্তক। ইছলামী শরিয়তে এলমে তাছাওয়াফের স্থান কোথায় তাহা তিনি এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রামাণ্য কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এক শ্রেণীর আলেম ইহাকে মোস্তাহাবের পর্য্যায় ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু পীর ছাহেব তদীয় তালীমে মারেফতে এই বিষয় প্রামাণ্য কেতাব সমূহ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এলমে তাছাওয়াফের যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ এলমে শরিয়ত শিক্ষা করা অবস্থা ভেদে যেমন, ফরজে আইন, ফরজে-কেফায়া এবং মোস্তাহাব, এইরূপ এলমে তাছাওয়াফ অর্জ্জন করার প্রয়োজনও তিন স্তরে বিভক্ত। এই সম্পর্কে পীর ছাহেব কেবলার তালীমে মারেফতে বহু প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা পীর ছাহেবের জীবনীর ৩য় খণ্ডে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি। তিনি এই পুস্তকে মোছাল্লামুচ্ছবুৎ, দোররোল, মোখতার, তওজীহ, শামী, গায়াতোল আওতার, এহইয়ায়ে

উলুমুদ্দিন, তফ্‌ছিরে রুহোল বয়ান, তফছীরে মাজহারী এবং গাওছে আজম হজরত বড় পীর ছাহেব রহঃ এর ছেররোল আছরার ; তরীকা সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ জামেউল ওছুল, হজরত সৈয়দ আহমদ ছেরহিন্দী, মোজাদ্দাদ-ই-আলফে-ছানী রহঃ এর মাকতুবাতে ইমাম রব্বাণী, মেরকাত, মাজাহেরে হক, মেশকাতুল মাছাবীহ এবং মরহুম মাওলানা কারামত আলী রহঃ এর জাদোত্তাক্‌ওয়া, তঃ রুহোল বয়ান, মা'নী এবং খোলাছা প্রভৃতি প্রামাণ্য কেতাব সমূহ অবলম্বনে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, তরিকার ছবক ও সমূহ যথা বিহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা তরিকা পন্থীদের জন্য প্রামাণ্য একখানা নিত্য ব্যবহার্য্য পুস্তক।

পীর ছাহেবের জুমা সম্পর্কিত পুস্তকাবলী

এতদ্দেশে জুমা জায়েজ কি না এই নিয়া মতভেদের সূত্রপাত হয় বাংলা ১২২৭ সনে। পীর ছাহেব জুমা পড়িতে আরম্ভ করার পরে এই বিষয়টি নিয়া তিনি বিশেষ তৎপর হন। তিনি বাহাছ তর্ক এবং ঝগড়া কলহকে একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; কাজেই তিনি এই সম্পর্কে দলীল প্রমাণ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় মনে করেন। সুতরাং তিনি ক্রমান্বয়ে ছয়খানা জুমা সম্পর্কিত কেতাব প্রণয়ন করেন। ইহার সর্ব্ব প্রথমখানা উর্দ্দূ 'মাছায়েলে ছালাছ' বা 'তিনটি প্রশ্ন' নাম দিয়া প্রণয়ন করেন। এইরূপ জুমার দ্বিধা ভঞ্জন,

আল-জুমা, জুমার সংক্ষিপ্ত দলীল, জুমার অকাট্য দলীল এবং এজহারোল হক নামক পুস্তক সমূহ প্রণয়ন করেন। ইহাতে জুমা সম্পর্কিত বহু তত্ব, ইহা ফরজ হওয়ার প্রমাণ, জুমার জন্য বাদশাহ, কাজী, শরীয়তের সংজ্ঞা অনুযায়ী শহর, বড়ো মছজিদের প্রমাণ, আখেরোজ্জোহর, ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ফেকাহ, হাদীছ ও তফছিরের বিভিন্ন প্রামাণ্য দলীল সমূহ ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

মরহুম মাওলানা কারামত আলী ছাহেব এ দেশে জুমা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে সম্ভবতঃ কোনও প্রামাণ্য কেতাব প্রণয়ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। পীর ছাহেব এই পুস্তকসমূহ দ্বারা বলিতে গেলে মরহুম মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের সংগ্রামের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। তিনি বাংলা ভাষায় জুমা সম্পর্কিত দলিল সমূহ অনুবাদ করিয়া প্রচার করার ব্যাপক ফল সমাজে দাঁড়াইয়া যায়। উল্লিখিত কেতাব সমূহ সহস্র সংখ্যায় সমাজে প্রচার হইয়া যাওয়াতে সাধারণ একজন মুন্শী ছাহেবও জুমা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছেন।

উক্ত কেতাব সমূহ প্রণয়নে বাগবি, খোলাছা, রুহোল বয়ান ও রুহোল মা'নী প্রভৃতি তফ্‌ছির সমূহ এবং ফতহোল কাদির, কেফায়া, মবছুত, হাশিয়ায়ে তাবিনোল হাকায়েক, বাহ্‌রোর রায়েক, মবছুত শামী, কাবিরী, মেনহাতোল খালেক, নওয়াজেল, কাজীখান, বাহরোর রায়েক, ছগিরী, আলমগীরী, ছেরাজিয়া,

এনায়া, শরাম্বলালী, শরহে মোলতাকা, শরহে কানজ, খাজানাতোর রওয়ায়েত, এবরাহীম শাহী, আরকানে আরবা, জামেউর রমুজ, জামেউল ফছুলীন, ফতোয়ায় বজ্জাজিয়া, জামেউল ফাতওয়া, ফতোয়ায় ছেরাজিয়া, মজালেছুল আবরার ও জাওহারাতু নাইয়ারাহ্ প্রভৃতি ফেকাহের বে-শুমার দলীল আনয়ন করিয়াছেন।

মাছায়েলে আরবা ঃ সঙ্গীত, বাদ্য, ছবি, অমুছলমানের মেলা পার্ব্বন ও মোরতাদ এই চারিটি মছলার সমন্বয়।

ছহীহ্ বোখারী ওমদাতোল কারী, শরহে মোছলেম, মেরকাত প্রভৃতি হাদীছ ও হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং মাজমাউল আনহোর, নূরোল ইজা, মারাকিল ফালাহ, তাহ্তাবী, দোর্‌রোল হেকাম, দোর্‌রোল মোন্তাকা, হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী, শামী এবং গায়াতোল আওতার প্রভৃতি ফেকাহ সমূহের বিস্তর প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর দুইটি 'অবদান' হইতে বাঁচিবার উপায় দেখা যায় না। এই দুইটি হইল ছবি ও গান বাদ্য। সংবাদ পত্র মাসিক পত্রিকা এবং সিনেমার সাহায্যে ছবি এবং রেডিওর মারফতে গান বাদ্য এতই ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকালয় বর্জ্জিত জঙ্গল, মরুভূমি এবং কবর ছাড়া এই দুইটি জিনিস হইতে বাঁচিবার স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অথচ এই দুইটিই হারাম। আলোচ্য বহিতে এই বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ অমুছলমানের পর্ব্ব

সমূহে যোগদান করা না-জায়েজ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন দলীল সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নারী ও পরদা ঃ

বিংশ শতাব্দীর আর একটি তরক্কীর আলামত হইল নারীর স্বাধীনতা। নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে ইছলাম নীরব নহে বটে, কিন্তু নারীর পর্দ্দা বলিয়াও একটি জিনিস ইছলামে রহিয়াছে। যুগের স্বাধীনতার ঝড় সেই পর্দ্দা একেবারেই উড়াইয়া নিয়া চলিয়াছে। পীর ছাহেব জমানার এই বে-সামাল অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখ করিতেন এবং জীবন-ভর এই বিষয় দেশ ও জাতিকে এই উৎকট স্বাধীনতার ভয়াবহ পরিণাম এবং খোদাই গজব সম্পর্কে সাবধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টারই একটি ফল হইল উক্ত পুস্তিকা। এই পুস্তকে তফছির, ফেকাহ ও হাদীছ সমূহের প্রচুর দলীল উদ্ধার করা হইয়াছে। পর্দ্দা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে উনিশটি অধ্যায়ে এই পুস্তকখানা বিভক্ত। ইহা একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ।

মজহাব ও তাক্‌লীদ ঃ

মজহাব সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা। মজহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক ইতিহাস। কি অনিবার্য্য কারণে এই মাজহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে; তৃতীয় হিজরী হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দীর মাজহাব অনুসরণকারী শ্রেষ্ঠ ওলামাগণের যোগ্যতা ও পরিচয় এবং ইমাম আজম

হজরত আবু হানিফা (রঃ)এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হইয়াছে। বহিখানায় বহুসংখ্যক প্রামাণ্য দলীল আনয়ন করা হইয়াছে। তিনি এই ফতোয়াটি সংকলনে দীর্ঘদিন বিশেষ শ্রম স্বীকার করেন।

ফতোয়া সঙ্কলন ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আর একটি বিশেষ খেদমৎ হইল ফতোয়া-সঙ্কলন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক ফতোয়া সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। দিবারাত্রি অবিরাম কাজের মধ্যে তিনি কি করিয়া যে এই সময় বাহির করিতেন তাহা ভাবিবার বিষয়। বিভিন্ন বিষয়ের মতভেদ ও বিভিন্ন মছলার সমাধান এই ফতোয়ায়ে রহিয়াছে। ইহা প্রায় সহস্রাধিক হইবে। এই ফতোয়া সমূহ ফতোয়ায় ছিদ্দীকিয়া নাম করণে ক্রমান্বয়ে পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত মাজহাব ও তাকলীদ এই ফতোয়ার এক খণ্ড বিশেষ।

এতদ্ব্যতীত, ছোট বড় আরও অনেকগুলি কেতাব তিনি সঙ্কলন ও প্রনয়ন করাইয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা ঃ

এই সকল পুস্তকের উপাদান সংগ্রহে, লেখায় ও অনুবাদের কাজে ক্রমান্বয়ে আরও কতিপয় লোক কাজ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সুক্ষ্মদর্শী ও সুবিজ্ঞ আলেম মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেব এবং আরও অনেকের উল্লেখযোগ্য খেদমত রহিয়াছে।

প্রথমে 'ছিদ্দিকীয়া ফাণ্ড' নামে একটি মুষ্টি চাউলের ফাণ্ড খোলা হয় এবং উহার আয় দ্বারাই এই মুদ্রন বিভাগের কাজ শুরু হয়। পরে মওলবী এমদাদ আলী ছাহেবের উদ্যম ও কর্ম্ম কুশলতায় ইহার উন্নতি সাধিত হয়। তিনি মোছলেম ষ্টোর নামে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করেন। তদ্দারাই মুদ্রন বিভাগের কাজ চলিত। ইহা ছাড়া পীর ছাহেব নিজ পকেট হইতেও প্রায়ই পুস্তক প্রকাশের সাহায্যার্থে দান করিতেন। এইরূপে দু'একখানা করিয়া পুস্তক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। এই সকল পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ টাকা অন্য কোনও কাজে ব্যয় করা হইত না। ইহা দ্বারা ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করিয়া পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে উহা মাদ্রাছাহ্ তহবীলের একটি নিজস্ব স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান মূলধন প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা।

পুস্তক সমূহ মাদ্রাছায় ওয়াকৃফ করা হইল

পীর ছাহেব এই সকল পুস্তক সঙ্গতভাবেই নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজ অপরিসীম শ্রমজাত এই পুস্তক সমূহ শর্ষিনা দারুছ ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাছায় ওয়াকফ করিয়া গিয়াছেন। ইহার স্বত্ব বা উপস্বত্ব তাঁহার বা তাঁহার বংশধরগণের কাহারও জন্য ভোগ্য হইবে না। পীর ছাহেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংশ্লিষ্ট আরও অনেকে

হেদায়াৎ ও সংস্কারমূলক বহু পুস্তক শর্ষিনা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মওলবী এমদাদ আলী ছাহেবের প্রচেষ্টা শীর্ষস্থানীয়। তিনি মুছলিম শিশুপাঠ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কার ও শিক্ষামূলক প্রায় ৪০ খানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত হইলেও ইহা পীর ছাহেবের হেদায়েতের একটি অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইবে। এই সকল পুস্তিকা সমাজের একস্তরে—যেখানে উঁচু দরের কবি ও সাহিত্যিকগণের গতিবিধি বিরল—সেখানে একদল পাঠক সৃষ্টি করিয়াছে, একটি প্রাণ-প্রবাহ জাগ্রত করিয়াছে, একটি আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত জোগাইয়াছে। সর্ব্বোপরি ইহা ইছলামের কোনও না কোনও শিক্ষা ও আদর্শকে লইয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা সময়ে এই সকল পুস্তিকার মূল্য ও কার্য্যকরিতা লইয়া আলোচনা করিব।

পীর ছাহেবের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে লিখিত ও এই সকল বিভিন্ন লেখকের ছোট খাটো পুস্তিকা আদর্শের দিক দিয়া অভিন্ন। কারণ, পীর ছাহেবের অনুমোদন ব্যতীত এই সকল পুস্তক প্রকাশ হইত না। এই সকল পুস্তকের প্রায় প্রত্যেকটিই পীর ছাহেবের নাম পরম শ্রদ্ধার সহিত বহন করিয়া আসিতেছে। সকল মিলাইয়া শর্ষিনা হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা শতাধিক হইবে। ইহার প্রচার সংখ্যা বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ। বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সর্ব্বত্রই এই সকল পুস্তক প্রচারিত রহিয়াছে। পীর ছাহেবের জীবন হইতে এই কর্ম্ম প্রবণতার উৎস উৎসারিত হইয়াছে।

বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

পীর ছাহেব মরহুম দিনী শিক্ষার জন্য সারা জীবন 'নেছার' করিয়া গিয়াছেন। নামের সঙ্গে কর্ম্মের এরূপ সাদৃশ্য কচিৎ দেখা যায়। তিনি সর্ব্বদাই দিনী শিক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি যেখানে বসিতেন, যেখানে যাইতেন; যাহার সহিত আলাপ করিতেন; সর্ব্বদাই শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিতেন। অবশ্য তিনি দিনী শিক্ষার জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা করিতেন। তিনি স্পষ্টতঃই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, দিনী শিক্ষায় ব্যাপক প্রসার ব্যতীত ইছলামের মৃত প্রাণকে জাগ্রত করিয়া তোলার উপায় নাই। অবশ্য তিনি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না এবং ইহার প্রতিবাদও তিনি করেন নাই। বরং স্থানে স্থানে ইংরেজী স্কুলে আর্থিক সাহায্যও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহে ইছলামী আমল ও আকিদার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া প্রাণে যারপরনাই দুঃখিত হইতেন। সুতরাং ইছলামের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখার জন্য মাদ্রাছাগুলির প্রতিষ্ঠা যে একান্তই অপরিহার্য্য তাহা তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিতেন।

কেহ কেহ বলিতেন "হুজুর! মাদ্রাছাহ শিক্ষার্থীরা কি করিয়া খাইবে? ইহাদের চাকুরী-নকরী জোটে না।" তিনি বলিতেন "রেজকের মালীক একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই নহে।

দিনী এলম শিক্ষা করা ফরজ। ইহা ব্যতীত আল্লাহর নিকট নাজাত নাই। আল্লাহ যে পরিমাণ রেজক রাখিয়াছেন তাহা আসিবেই ইহা বিশ্বাস কর। রেজক যেমন জোটে তেমন খাইয়াই দীনের কাজ করিয়া যাইতে হইবে।"

এরূপ প্রশ্নও পীর ছাহেবের গোচরীভূত হইত যে, তিনি কেবল মাদ্রাছাহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন দু'একটা স্কুলও করিতেন যদি....। তিনি তাঁহার উত্তরে বলিতেন "বাবা! স্কুল প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ বহুলোকের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে, অনেকেই এই কাজ করিতেছেন; দীন প্রচার করার জন্য মাদ্রাছাহ্ প্রতিষ্ঠা করার লোক নাই। দীন ইছলাম আজ ইয়াতিমের মতো হইয়াছে। আমি সেই জন্যই কিছু দীনের খেদমত করিতেছি।" ইত্যাদি।

যাই হোক তিনি যেখানেই যাইতেন, কিংবা লোক পাইতেন মাদ্রাছাহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করিতেন এবং মাদ্রাছাহ্ গঠন করিবার কাজে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতেন। এই চেষ্টার ফলে তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক মাদ্রাছাহ্ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নিম্নে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত, পৃষ্টপোষিত এবং সাহায্যকৃত কতিপয় মাদ্রাছার তালিকা প্রদত্ত হইল।

পীর ছাহেবের নিজ প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাছাহ সমূহ

১। পাঙ্গাসিয়া নেছারিয়া ছিনিয়ার মাদ্রাছাহ্ (বরিশাল)
২। ধানীশাপা ইছলামিয়া " " "
৩। চালিতা বুনিয়া " " "
৪। মিঠাখালী " "
৫। চিংড়া খালী " "
৬। মধ্য রূপধন " "
৭। কুন্দিয়াল পাড়া " "
৮। দৌলৎপুর " "
৯। কুশলা (ফরিদপুর) " "
১০। গঙ্গাপুর " "
১১। গজালিয়া " "
১২। রায়েন্দা ইছলামিয়া মাদ্রাছাহ (খুলনা)
১৩। বীরপাশা ফোরকানিয়া "
১৪। পাথরঘাটা ছিদ্দিকীয়া "
১৫। বাসণ্ডা ফোরকানিয়া "
১৬। ইছাদী ইছলামিয়া "
১৭। ধূলখোলা " "

১৮। নূরাইনপুর নেছারিয়া ছিনিয়ার মাদ্রাছাহ্
১৯। বাজে মহল " "
২০। টিকিকাটা " "
২১। তেলীখালী " "
২২। মোহছেনুদ্দিন ইছলামিয়া "
২৩। শৌলা " "
২৪। ভাষান্ চর " "
২৫। ঘটকের আন্দুয়া " "
২৬। মহিষ খোলা ছালেহিয়া হেফজুল কোর্আন মাদ্রাছাহ
২৭। খাকবুনিয়া ইছলামিয়া মাদ্রাছাহ

নিম্নোক্ত মাদ্রাছ সমূহ পীর ছাহেব কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত ও সাহায্য কৃত

২৮। মাহমুদ কাঠী আহমদিয়া মাদ্রাছাহ
২৯। বেতমোড় আশ্রাফুল উলুম "
৩০। নামাজপুর ইছলামিয়া "
৩১। হোগলটুরী হামেদিয়া ইছলামিয়া ছিনিয়ার মাদ্রাছাহ
৩২। পালট কেরাতিয়া মাদ্রাছাহ "
৩৩। ডিক্রির চর নেছারিয়া "
৩৪। গালূয়া দুর্গাপুর "
৩৫। টবগী ছিনিয়ার "
৩৬। করুণা মোকামিয়া "

৩৭। কানুদাস রুঠী মাহমুদিয়া মাদ্রাছাহ্
৩৮। হাড়িটানা ইছলামিয়া "
৩৯। তিমিরকাঠী ইছলামিয়া "
৪০। পাতার চর লক্ষীপুর ইছলামিয়া মাদ্রাছাহ
৪১। খারিজ্জমা ছায়ীদ আলী ইছলামিয়া "
৪২। আলীমাবাদ " "
৪৩। মল্লিকের বেড় " "
৪৪। আমতলী " ছিনিয়ার
৪৫। দেবীপুর " "
৪৬। পানপট্টি ছালেহীয়া " "
৪৭। গোয়ালিয়া বাঘা হাফেজিয়া "
৪৮। জরীপের চর নেছারিয়া "
৪৯। পূর্ব্ব শলিয়া বাকপুর "
৫০। বেলুহার নেছারিয়া ইছলামিয়া "
৫১। ধনিয়া ফোরকানিয়া "
৫২। বান্ধব-পাড়া ছালেহিয়া "
৫৩। বাটামারা ইছলামিয়া "
৫৪। বড় কাঠালিয়া " "
৫৫। মিরজা-কালু " "
৫৬। দুর্গাপুর চাঁদপাশা" "
৫৭। খানা-কুনিয়ারী " "
৫৮। সুটিয়াকাঠী হাফেজিয়া "

৫৯। চাঁদ-পাশা ইছলামিয়া

৬০। কাক-ডাঙ্গা নৈশ-বিদ্যালয়

৬১। টুমচর ইছলামিয়া ছিনিয়র মাদ্রাছাহ, নাওয়াখালী

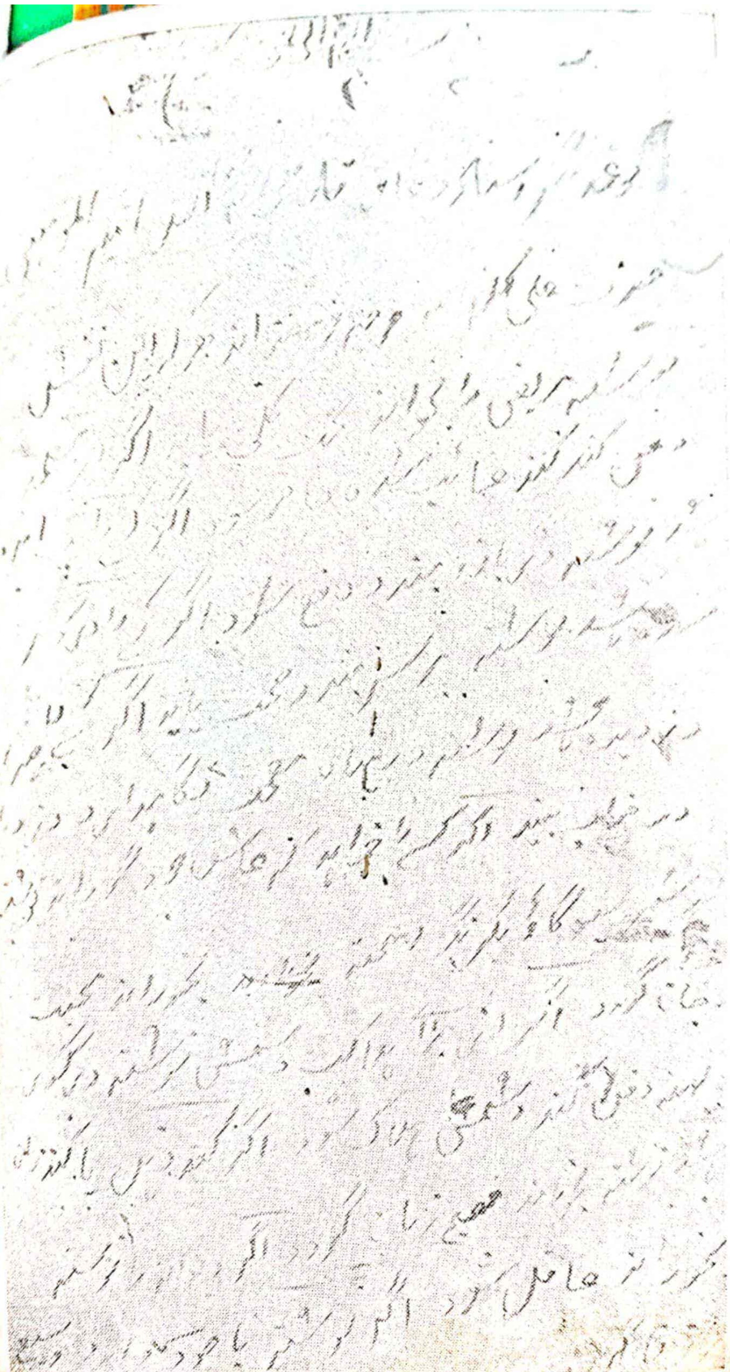
৬২। মাগুরা কেরাতিয়া মক্তব

৬৩। কানুদাস কাঠী মাদ্রাছাহ। প্রভৃতি।

এই সকল মাদ্রাছাহ, মক্তব ছাড়া আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; ইহাতে অর্থ সাহয্য জোগাইয়াছেন এবং নানা ভাবে ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া নিয়াছেন।

গ্রামের অভ্যন্তরে—যেখানে যুগের আব-হাওয়া বহেনা, উচ্চ-শিক্ষিতেরা প্রবেশ করে না, প্রাণ-শক্তি যেখানে নির্ব্বাপিত, জন-সধারণ যেখানে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, লক্ষ্যহীন, পথ-ভ্রষ্ট নিপিষ্ট ও জর্জ্জারিত—এই সকল মাদ্রাছাহ সেখানে ইছলামের এক একটি ঝাণ্ডা উচু করিয়া অতীতের স্বাক্ষর নিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোরআনের সুমধুর ঝংকার সে কোকিলের কুহু-তানের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছে। প্রভাতের নিদ্রা-জড়িত আলস্য পরায়ণ গ্রামকে সে দিয়াছে বেলাল-কণ্ঠের আজানধ্বনী। এই ভাবে পাকিস্তানের ভিত্তিভূমি সে অতীতের দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া তৈয়ার করিয়াছে। আজ এই সকল মাদ্রাছাহ হইতেই বাহির হইয়া আসিতেছে পাকিস্তানের খাঁটি-সৈনিক, আদর্শ নাগরিক, তৎসঙ্গে নেজামে ইছলামের অপ্রতিরোধ্য দাবী।

—প্রথম ভাগ সমাপ্ত—



মরহুম পীর ছাহেব কেবলার হাতের লেখা